আর সে একথা বুঝতে বাধ্য হবে, এখন পর্যন্ত যেহেতু মানবতার গুলশান অসম্পূর্ণ রইল, সেহেতু ভবিষ্যতের কি বিশ্বাস?

এমনিভাবে সে গুলশানের বারি সিঞ্চন, পরিচর্যা এবং তার ফুল ও ফল দ্বারা উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে নতুন মালির অপেক্ষায় থাকবে, যে গুলিস্তানকে ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ করবে।

নবুওয়তের দাবীদাররা

মীর্জা গোলাম আহমদের চেষ্টা-অপচেষ্টা, তার আন্দোলনের অবশ্যম্ভাবী যৌক্তিক পরিণতি এই হওয়া উচিত ছিল, নবুওয়তের মর্যাদা, সম্মান ও দায়িত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য বিলীন হয়ে যাবে। তারা নবুওয়তের সিলসিলা জারী থাকার ব্যাপারে কলমের যে শক্তি ব্যয় করেছে, যেভাবে এর প্রচার ও প্রসার করেছে, তারা এলহামের যে গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর ওপর যেভাবে নবুওয়তের ভিত্তি দাঁড় করিয়েছে, এর পরিণতি এই হওয়া উচিত ছিল, নবুওয়ত একটি ছেলেখেলায় রূপান্তরিত হয়ে পড়বে।

যদিও সে নবুওয়তের ধারাবাহিকতা অটুট থাকার কথা বলেছে শুধু নিজের নবুওয়তকে সম্ভাব্যতা ও প্রামাণ্য করার জন্য এবং খতমে নবুওয়ত অস্বীকার করেছে শুধু নিজের জন্য নতুবা সে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নিজেকেই খাতামুন্নাবিয়্যীন বা শেষ নবী মনে করে।

মীর্জা গোলাম আহমদ বলে, "এবং এই প্রাসাদে একটি ইটের জায়গা খালি ছিল অর্থাৎ যারা নেয়ামতপ্রাপ্ত হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলেন, এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করবেন এবং সর্বশেষ ইটটি বসিয়ে পূর্ণতায় পৌছিয়ে দেবেন। সুতরাং আমিই সেই ইট।"[১]

আল্লামা ইকবালের বলিষ্ঠ ভাষায় ঃ স্বয়ং আহমদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার প্রমাণ উপস্থাপন, যা মধ্যযুগের দার্শনিকদের জন্য শোবার কারণ হতে পারে এই যে, যদি অন্য কোন নবী সৃষ্টি হতে না পারে, তাহলে পয়গাম্বরে ইসলামের আধ্যাত্মিকতা (রূহানিয়াত) অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সে স্বীয় দাবী পয়গাম্বরে ইসলামের রূহানিয়্যাতে নতুন পয়গম্বর সৃষ্টি হওয়ার শক্তি ছিল–এর পক্ষে নিজের নবুওয়তকে পেশ করে থাকে। কিন্তু আপনি যদি তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর রূহানিয়্যাত একের অধিক নবী সৃষ্টি করতে কি সক্ষম?

১. 'খুতবায়ে এলহামিয়া', পৃষ্ঠা ১১২।

তাহলে এর উত্তর আসবে 'না'-সূচক। এ ধারণা এ কথারই নামান্তর যে, মুহাম্মদ (সা.) শেষ নবী নন। আমিই শেষ নবী।

এ কথা অনুধাবন করার পরিবর্তে খতমে নবুওয়তের ইসলামী ধারণা মানব জাতির ইতিহাসে সাধারণভাবে এবং এশিয়ার ইতিহাসে বিশেষভাবে কী পরিমাণ সাংস্কৃতিক মর্যাদা রাখে!

আহমদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার ধারণা হলো, খতমে নবুওয়তের ধারণা এই অর্থে, 'মুহাম্মদ (সা.)-এর কোন অনুসারী নবুওয়তের মর্তবা হাসিল করতে পারবে না' আল্লাহ্ তা'আলা মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়তকে অসম্পূর্ণ করে দেয়। যখন আমি আহমদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার ধ্যান-ধারণা তার নবুওয়তের দাবীর আলোকে অধ্যয়ন করি, তখন আমার মনে হয়, সে নিজের দাবীর পক্ষে পয়গাম্বরে ইসলামের সৃজনশীল শক্তিকে শুধু একজন নবী অর্থাৎ আহমদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার জন্য পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করে পয়গাম্বরে ইসলামে আখেরী নবী হওয়াকে অস্বীকার করে ফেলে। এভাবে এ নতুন পয়গাম্বর নিজের আধ্যাত্মিক পূর্বসূরী খতমে নবুওয়তের ওপর নীরবে হস্তক্ষেপ করে বসে।[১]

কিন্তু মানুষের মন এই সূক্ষ্ম দর্শন বুঝতে অক্ষম যে, হুযুর পাক (সা.)-এর নবুওয়ত সৃজনশীল শক্তি একটিমাত্র সত্তার অস্তিত্বের জন্য নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।

ইতোপূর্বে এ শক্তি নিজের কাজও করেনি আর এ লোকের [যে মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমনের তের শ' বছর পর এসেছে এবং এরপর জানা নেই, পৃথিবী আর কত হাজার পর্যন্ত চলবে] পরও কোনো কাজ করতে পারবে না। যেমন অন্যদের আলোচনায় স্বয়ং মীর্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদ লেখে ঃ আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের ব্যাপারে বলেন ঃ অর্থাৎ তারা আল্লাহ্ তা'আলার মর্যাদা বোঝেনি এবং এটা বুঝেছে, আল্লাহর ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে গেছে। এজন্য কাউকে কিছু দিতে পারবেন না। এরূপভাবে এ কথা বলে, আল্লাহভীতিতে যতই বেড়ে যাক, পরহেযগারী ও তাকওয়ায় কয়েকজন নবীকেও অতিক্রম করে ফেলুক এবং আল্লাহর মারেফত-সান্নিধ্য যতটুকুই অর্জন করুক না কেন, আল্লাহ্ তাকে কখনও নবী বানাবেন না।

তাদের এমনটি বোঝা আল্লাহ্ তা'আলার মর্যাদাকে না বোঝার কারণেই হয়েছে নতুবা একজন কেন, আমি তো বলি হাজার হাজার নবী হবে।[২]

১. পণ্ডিত নেহেরুর প্রশ্নমালার উত্তর। হরফে ইকবাল, পৃষ্ঠা ১৫০-১৫১।

২. আনওয়ারে খেলাফত, পৃষ্ঠা ৬২।

সুতরাং মীর্জা গোলাম আহমদের পর মানুষের নবুওয়তে দাবী উত্থাপনের ব্যাপক দুঃসাহস হয়ে গেল। আমাদের কাছে ভারতবর্ষের ইতিহাস মোটামুটিভাবে যা বিস্তারিত বিবরণসহ সংরক্ষিত রয়েছে আকবর ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জানা নেই, যে খতমে নবুওয়তের অস্বীকার এবং নতুন ধর্ম প্রকাশ করার দুঃসাহস দেখিয়েছে।

আকবরও এতো সুশৃঙ্খল ও সুস্পষ্টভাবে নতুন নবুওয়তের দাবী তোলে নি। কিন্তু মীর্জার পর এ দরজা সাধারণভাবে খুলে গেছে। প্রফেসর ইলিয়াস বরনী সাহেব ১৩৫৫ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৬ ইং পর্যন্ত সাতজন নবুওয়তের দাবীদারের কথা বলেছেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই, যদি বেশী গুরুত্ব দিয়ে ঐ নবুওয়তের দাবীদারদের আদম শুমারী করা হয়, তাহলে শুধু পাঞ্জাবেই এর চেয়ে অনেক বেশী সংখ্যার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

নবুওয়তের ঐ দাবীদারদের আধিক্য ও খামখেয়ালীর বিপক্ষে স্বয়ং মির্জা বশীরুদ্দীন মাহমুদই প্রমাণ উপস্থাপন করেছে। একটি ভাষণে সে বলেছে, "দেখুন, আমাদের দলেই কতজন নবুওয়তের দাবীদারের উত্থান হলো। তাদের মাঝে একজন ব্যতীত সকলের ব্যাপারে আমার ধারণা এই, তারা মিথ্যা কথা বলেন না। আসলে প্রথমে তাদের এলহাম হয়েছে এবং আশ্চর্যের কথা নয়, এখনো হচ্ছে, কিন্তু ত্রুটি এই, তারা নিজের এলহাম বুঝতে ভুল করেছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছেন, যাদের ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগতভাবে জানাশোনা আছে এবং আমি সাক্ষ্য দিতে পারি, তাদের মাঝে নিষ্ঠা ছিল, খোদাভীতি ছিল। ভবিষ্যত সম্বন্ধে আল্লাহই জানেন, আমার এ ধারণা কতটুকু যথাযথ। তবে শুরুতে তাদের অবস্থা ছিল নিষ্ঠাপূর্ণ। তাদের এলহামের একটি অংশ খোদায়ী এলহাম ছিল। কিন্তু ত্রুটি এই হয়ে গেছে, তারা এলহামের রহস্য বুঝতে অক্ষম হয়েছেন এবং হোঁচট খেয়েছেন।"[১]

মুসলমানদের আত্মকলহ

এই নতুন নবুওয়ত দ্বারা ইসলামী জগতে যে তীব্র বিশৃংখলা, মুসলমানদের যে ভয়াবহ আত্মকলহ এবং উম্মতের ঐক্যে যে দুঃখজনক ফাটল ধরেছে, তা চিন্তা করলেও একজন মুসলমানের গা শিউরে না উঠে পারে না।

ধর্মহীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার এই যুগে স্বভাবতই মানুষের ভেতর 'আনাল হক্ব' ও 'আনান্নাবিয়্যু' বলার আগ্রহ নেই। কিন্তু মীর্জা গোলাম আহমদের রচনাবলীর প্রতিক্রিয়া ও কাদিয়ানী মুবাল্লিগদের প্রচারণার কারণে যদি আজ

১. আল-ফযল, ১লা জানুয়ারী, ১৯৩৫।

ইসলামী বিশ্বে নবুওয়তের দাবী উত্থাপনের আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং মুসলিম জাহানের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজের নবুওয়তের পতাকা ধরে, আর যারা এই পতাকার ছায়াতলে আশ্রয় না নেয়, নবুওয়তের অনিবার্য ফল হিসেবে তাদের কাফের বলা শুরু হয়ে যায়, তাহলে ইসলামী বিশ্বে কি রকম বিশৃঙ্খলা ও আত্মকলহের সৃষ্টি হতে পারে? আর মুসলিম জাহান কি রকম ধর্মীয় দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়বে? যে জাতির উম্মতের আবির্ভাব ঘটেছে বর্ণ, গোত্র ও সাম্প্রদায়িকতার বিচ্ছিন্নতাকে নির্মূল করার জন্য, যে জাতির আবির্ভাব ঘটেছে সমগ্র মানব জাতিকে পরস্পরের ভাই ও সহমর্মী বানানোর জন্য সে জাতি কিভাবে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও পরস্পর আত্মঘাতী সংঘর্ষে লিপ্ত হবে? কিভাবে একে অপরকে কাফের বলতে শুরু করবে?

এই আশংকার কথা অনুভব করেছিলেন মৌলবী মুহাম্মদ আলী লাহোরীও। অত্যন্ত সুন্দর ও বলিষ্ঠভাবে নিজের একটি নিবন্ধে তিনি একথা প্রকাশও করেছিলেন। কিন্তু তিনি চিন্তা করেন নি, এই ভয়াবহ দরজা মীর্জা গোলাম আহমদই খুলেছে। ইসলামের পুরো ইতিহাসে সেই প্রথম ব্যক্তি, যে নবুওয়তের ধারাবাহিকতা জারী থাকাকে একটি দাওয়াত ও একটি আন্দোলনের রূপ দিয়ে পেশ করেছে।

মৌলবী মুহাম্মদ আলী সাহেব ধীশক্তিসম্পন্ন লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, "আল্লাহর দোহাই একটু চিন্তা করুন! মীর্জার এ বিশ্বাস যদি যথার্থ হয় যে, নবী আসতে থাকবেন এবং হাজারো নবী আসবেন (মুহাম্মদ আলী সাহেব এই বিশ্বাসের সূচনাকারী বা লালনকারী নন, তিনি মীর্জা গোলাম আহমদের ভাষ্যকার মাত্র।) যেমন সে স্পষ্টভাবে 'আনয়ারে খেলাফত' নামক গ্রন্থে লিখে দিয়েছে, তাহলে এ হাজারো গ্রুপ একে অপরকে কাফের আখ্যাদানকারী হবে কিনা এবং ইসলামী ঐক্য কোথায় যাবে?

এ কথাও যদি মেনে নেয়া হয়, সে সব নবী আহমদী জামাতেই হবে, তাহলে আহমদী জামাতের কয়টি টুকরো হবে?

অতীত যুগের রীতিনীতি সম্পর্কে তোমরা এতটুকু অজ্ঞ নও, নবীর আগমনের পর কিভাবে একটি দলের সাথে তার বিরোধ বাঁধে!

তিনি প্রভু যিনি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাতে সমগ্র পৃথিবীর জাতিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এখন মীর্জা গোলাম আহমদ কি মুসলমানদেরকে এভাবে শতধাবিভক্ত করে দিতে চায় যে, একে অপরকে কাফের বলতে শুরু করবে? পারস্পরিক ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বন্ধন বিচ্ছিন হয়ে পড়বে?

মনে রেখ ! ইসলামকে অপরাপর সকল মতবাদের ওপর বিজয়ী করার প্রতিশ্রুতি যদি সত্য হয়, তাহলে ইসলামের ওপর এই মহাবিপদের দিন কখনো আসতে পারে না যে, হাজারো নবী স্ব স্ব দল নিয়ে ঘুরে বেড়াবে, হাজার দেড়

ইটের মসজিদ হবে, যার পূজারীরা স্ব স্ব স্থানে ঈমান ও নাজাতের ঠিকাদারী নিয়ে বসে থাকবে এবং অপরাপর মুসলমানদেরকে কাফের ও বেঈমান সাব্যস্ত করতে থাকবে।"[১]

ভুল ও ভয়াবহ সিদ্ধান্ত

মীর্জা গোলাম আহমদের একটি সিদ্ধান্ত ইসলামী ধ্যান-ধারণার জন্য হতাশা ও ইসলামী সমাজের জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি স্বতন্ত্র একটি দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছে। সিদ্ধান্তটি হলো ঃ আল্লাহর সাথে কথোপকথনকে সে ধর্মের সত্যতার জন্য শর্ত এবং এত্তেবা ও মুজাহাদার (সাধনা) স্বাভাবিক পরিণতি মনে করে।

তার মতে যে ধর্মে আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথনের সিলসিলা জারী নেই, সে ধর্ম মৃত ও বাতিল, বরং সেটা শয়তানের ধর্ম এবং তা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। আর যে ধর্মের অনুসারী মুজাহাদা, চেষ্টা-সাধনার বলে এই সম্পদ দ্বারা মহিমান্বিত হতে না পারবে, সে গোমরাহ, পথভ্রষ্ট, চরম বঞ্চিত ও অন্ধ। বারাহীনে আহমদিয়া'র পঞ্চম খণ্ডে সে লেখে, "এমন নবী কি ধরনের সম্মান, কিসের মর্তবা, কিসের প্রভাব, কি ধরনের ঐশ্বরিক শক্তি নিজের অস্তিত্বে রাখেন, যার অনুসারীরা শুধুই চক্ষুহীন-অন্ধ হয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কথোপকথন ও সম্বোধনের মাধ্যমে তাদের চক্ষু খুলে দেন না!"

এটা কত বড় বাজে ও ভ্রান্ত আক্বীদা যে, শুধু এই কল্পনা করতে হবে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পর ওয়াহীয়ে ইলাহীর দরজা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে এবং ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত এর কোন আশাও নেই! শুধু কিসসা-কাহিনীর পূজা করো।

সুতরাং এ ধরনের ধর্ম কি কোন ধর্ম হতে পারে যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার কোন খবরই জানা যায় না? যা কিছু আছে শুধু কিসসা-কাহিনী! যদি কেউ তার পথে নিজের প্রাণও উৎসর্গ করে দেয়, তাঁর সন্তুষ্টি কামনায় নিঃশেষ হয়ে যায় এবং সব কিছুর ওপরে তাঁকেই গ্রহণ করে, তবু তিনি ঐ ব্যক্তির সামনে স্বীয় পরিচয়ের দরজা খুলে দেন না এবং কথাবার্তা ও সরাসরি সম্বোধন দ্বারা তাকে মর্যাদাবান করেন না!

আমি আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করে বলছিঃ এ যুগে এ ধরনের ধর্মের প্রতি আমার চেয়ে বেশী নিরাসক্ত আর কেউ নেই। আমি এ ধরনের ধর্মের নাম রাখি শয়তানী ধর্ম। এটা রহমানী বা আল্লাহ্প্রদত্ত ধর্ম নয়। আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি, এমন ধর্ম জাহান্নামের দিকেই নিয়ে যাবে।"[২]

১. রদ্দে তাকফীরে আহলে কেবলা, পৃষ্ঠা ৪৯-৫।
২. বারাহীনে আহমদিয়া, পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৩।

কথোপকথনকে শর্ত নির্ধারণ করার পরিণাম

মীর্জা গোলাম আহমদ আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথনকে মা'রেফাত, নাজাত, সততা ও হক্কানিয়্যাতের শর্ত নির্ধারণ করে যে ধর্মকে আল্লাহ্ তা'আলা সহজ ও সকলের জন্য আমলের উপযোগী বানিয়েছেন, সেই ধর্মকে অত্যন্ত কঠিন ও সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

.. يُرِيْدُاللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَايُرِيدُبِكُمُ الْعُسْرَ...

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করতে চান এবং তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না।" [সূরা বাক্বারা ঃ ১৮৫]

هُوَاجْتَبٰكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ -

"এবং তিনি ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন সংকীর্ণতা রাখেন নি।" [সূরা হজ্জ ঃ ৭৮]

لَايُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّاوُسْعَهَا -

"আল্লাহ্ তাআলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না।" [সূরা বাক্বারা ঃ ২৮৬]

কিন্তু মা'রেফাত ও নাজাতের জন্য যদি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথনকে শর্ত করা হয়, তাহলে এই দ্বীন থেকে অধিক কঠিন কোন বস্তু হতে পারে না। কারণ অনেক মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই এই কথোপকথন ও এলহামের সাথে সম্পর্কহীন। সে যতই মুজাহাদা-সাধনা করুক না কেন, কথোপকথন ও এলহামের দরজা তার সামনে খুলবে না।

অনেক লোক আছে প্রকৃতিগতভাবে এর সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু তাদের ঐ সাধনার (যা আল্লাহর সাথে কথোপকথনের জন্য শর্ত) সুযোগ বা তৌফিক নেই।

ঐ বিশ্বব্যাপী দিগ্বিজয়ী ধর্ম, যার আবির্ভাব ঘটেছে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য, যা সবাইকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দেয়—মা'রেফাত, নাজাত, মাগফেরাত, আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌছার জন্য এত কড়া শর্ত আরোপ করতে পারে না, লক্ষ-কোটি মানুষের মাঝে গুটি কয়েক মাত্র মানুষ যা পূরণ করতে সক্ষম হন।

অপরদিকে কুরআন শরীফে মু'মিনীন ও সফলকাম মানুষদের গুণাবলী দেখা যেতে পারে।

সূরায়ে 'আল-মু'মিনূন'-এর প্রথম রুকু পড়ুন ঃ কাদ আফলাহাল মুমিনূন–

সূরায়ে আল-ফুরকানের সর্বশেষ রুকু পড়ুন ঃ ওয়া ইবাদুর রহমানিল্লাযীনা–

প্রথম সূরার প্রথম আয়াত পুনঃআলিফ-লাম-মীম যালিকাল কিতাব...

আলিফ লাম মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী মুত্তাকীদের জন্য, যারা অদেখা বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে। [সূরা বাকারা ঃ ১, ২ ও ৩]

এ আয়াতগুলোর কোথাও আল্লাহর সাথে কথোপকথনকে হেদায়াত ও কল্যাণের জন্য শর্ত হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়নি, বরং এর উল্টো 'ঈমান বিলগায়েব বা অদেখা বিষয়ের ওপর বিশ্বাসকে হেদায়াতের জন্য প্রথম শর্ত হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

আর ঈমান বিল-গায়েবের অর্থই হলো ঃ নবীর ওপর আস্থা রেখে (যাঁকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন ইচ্ছায় আল্লাহর সাথে কথাবার্তার জন্য নির্বাচিত করেছেন) গায়েবী রহস্যাবলীকে যা শুধু জ্ঞান ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানা যায় না, তা মেনে নেয়া।

যদি মীর্জা গোলাম আহমদের কথা মেনে নেয়া হয়, আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলা মারেফাত ও নাজাতের পূর্বশর্ত, তাহলে ঈমান বিল-গায়েবের প্রয়োজন আর থাকে না এবং এর ওপর কুরআন এত জোর দিল কেন, তাও বোধগম্য হয় না।

হযরত সাহাবায়ে কেরাম (র.)-এর পবিত্র জীবন আমাদের জন্য মডেল হিসেবে রয়েছে। জিজ্ঞেস করা যেতে পারে, তাঁদের মধ্য হতে কয়জন আল্লাহর সাথে কথাবার্তা এবং আল্লাহর সম্বোধনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন? হাদীস ও ইতিহাস দ্বারা কয়জনের ব্যাপারে প্রমাণ করা যেতে পারে, আল্লাহর সাথে তাঁদের কথোপকথন হয়েছিল?

ঐ যুগের ইতিহাস ও ঐ মোবারক জামায়াতের প্রকৃতি ও অবস্থা বরং মানবীয় প্রকৃতি ও চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি এই দাবী করতে পারে না যে, লক্ষাধিক সদস্যবিশিষ্ট এই পবিত্র জামায়াতের কারো আল্লাহর সাথে কথাবার্তা হয়েছিল।

সাহাবায়ে কেরামেরই যখন এই অবস্থা, তাহলে পরবর্তীদের ব্যাপারে আর কি বলা যেতে পারে?

নবুওয়তের ধারাবাহিকতা অস্বীকারের নেপথ্যে

আল্লাহর সাথে সরাসরি কথোপকথনের এই গুরুত্ব ও সার্বজনীনতা মূলত পর্দার আড়াল থেকে নবুওয়তের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ এবং একটি গোপন ষড়যন্ত্র।

আল্লাহর সাথে কথাবার্তার এই ব্যাপকতা ও ধারাবাহিকতার পর নবুওয়তের ধারাবাহিকতার যুক্তিসঙ্গত কোন প্রয়োজন বাকি থাকে না।

পবিত্র কুরআন ও সকল ঐশী ধর্ম মানুষের হেদায়াত, মারেফাতে এলাহী অর্জন, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী ও আল্লাহর ইচ্ছার পরিচয় এবং অদৃশ্য রহস্যের জ্ঞানকে সিলসিলায়ে নবুওয়তের অধীন ও এর সাথে সম্পৃক্ত করেছে।

কুরআন হেদায়াপ্রাপ্ত, মুমিনদের ভাষায় বলছে—

وَقَالُوْا الْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِيْ هَدٰنَا لِهٰذَا قف وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَاۤ اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ ج لَقَدْ جَاۤءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ -

"আল্লাহর শোকর যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না, যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন। আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ আমাদের কাছে সত্য কথা নিয়ে এসেছিলেন।"

[সূরা আল-আরাফ ঃ ৪৩]

অন্যত্র আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলীর (যাত ও সিফাত) ব্যাপারে জাহেলী ও মুশরেকী ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসকে খণ্ডন করে এরশাদ হয়েছে ঃ

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ج وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ج وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ -

"পবিত্র আপনার পরওয়ারদেগারের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র, যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। পয়গাম্বরগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক! সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর নিমিত্ত।" [সূরা আস সাফাত ঃ ১৮০-১৮২]

নবী (আ.)-গণকে প্রেরণের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজন নির্দেশ করে এরশাদ হয়েছে ঃ

رُسُلًا مُّبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ -

"সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী রাসূলগণকে প্রেরণ করেছি, যাতে রাসূলগণের আগমনের পরে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপ করার মত কোন অবকাশ মানুষের জন্য না থাকে।" [সূরা আন্ নিসা ঃ ১৬৫]

মীর্জা গোলাম আহমদের ওহীর ধারাবাহিকতা জারী থাকা ও আল্লাহর সাথে কথোপকথনের দর্শনের অনিবার্য পরিণামের ওপর যদি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা ও জ্ঞানের আলোকে এই দর্শনের বিশ্লেষণ ও পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন অংশ

পর্যবেক্ষণ করা হয়, তাহলে এখানে খতমে নবুওয়াতের পরিবর্তে সিলসিলায়ে নবুওয়তকে অস্বীকার করার দৃষ্টিভঙ্গিই পরিলক্ষিত হয় এবং হেদায়াত ও মারেফাতে ইলাহী ও সম্মোহন (Mesmerism) [অস্ট্রিয়ার মিঃ মিসমের (১৭৩৪-৭৮ খ্রীঃ) কর্তৃক আবিষ্কৃত পাণ্ডিত্য বিশেষ, যা দ্বারা অপরের হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি করা যায় এবং প্রভাবিত ব্যক্তিকে যে কোন কথা জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দিতে পারে] এবং আত্মা উপস্থিত করার আধুনিক আন্দোলন (Spiritualism) ইত্যাদির ন্যায় একটি আত্মিক সাধনা হয়ে পড়বে।

কথোপকথনের উৎস নির্ধারণ

অতঃপর আল্লাহর সাথে কথোপকথন ও আল্লাহর সম্বোধনকে পর্যালোচনা করার মাপকাঠি কি? আর এরই বা কি নিশ্চয়তা আছে, মানুষ যা কিছু শুনছে, তা তার ভেতরের কোন আওয়াজ বা তার পারিপার্শ্বিক কোন প্রতিধ্বনি অথবা তার অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা ও সমাজের প্রতিক্রিয়ার ফল নয়? যারা ঐশী ইঙ্গিত ও কথোপকথনের পুরনো সমষ্টি দেখেছেন, তাদের জানা আছে, এর কত বড় অংশ কাল্পনিক কথা ও প্রক্ষিপ্ত চিন্তাধারার লালন ও প্রসার ঘটায়, যা সৃষ্টি করেছিল পুরাণ (Mythology)।

মিসরের নব্য প্লেটোবাদ (New Platonism)-এর 'আল্লাহর জ্যোতি দেখা' ও 'আল্লাহর সাথে কথোপকথন'-কে লক্ষ্য করা যেতে পারে।

তাদের ঐ আধ্যাত্মিকতা ও কথোপকথন সে সময়ের দার্শনিক ও পৌরাণিক কাহিনীকারদের বানোয়াট কল্পিত কাহিনী কি বিশ্বাস করেনি? খোদ ইসলামী যুগেও কিছু আহ্লে মুকাশাফাহ ও মুকালামাহ বা আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন হওয়ার দাবীদার আকলে আউয়ালের সাথে মুসাফাহা করা ও এর সাথে কথাবার্তা বলার ব্যাপার বর্ণনা করে, যা পুরনো প্রক্ষিপ্ত দর্শন, বরং গ্রীক পুরাণের একটি কাল্পনিক ধারণামাত্র।

স্বয়ং মীর্জা গোলাম আহমদের কথোপকথনের একটি বিরাট অংশ তার যুগ, পারিপার্শ্বিকতা ও সমাজের প্রতিক্রিয়ায় প্রভাবান্বিত এবং এই পতনোন্মুখ সমাজের প্রতিচ্ছবি বলে মনে হয়, যে সমাজে সে বেড়ে উঠেছিল এবং সেখানে নিজের দাওয়াত নিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল, বরং একটি বড় অংশ এ ধরনের, যার ব্যাপারে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ একজন পর্যবেক্ষকের মনে হয়, এর উৎস আলিমুল গায়েব আল্লাহ্ তা'আলা নন্, বরং ভারতের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণকারী শাসন ব্যবস্থা।

বিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর স্যার মুহাম্মদ ইকবাল মীর্জা গোলাম আহমদের আন্দোলন, তার কথোপকথন (মুকালামাহ) ও ইলহামসমূহকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি এই রহস্যকে নিজস্ব যুক্তিপূর্ণ বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে সুন্দররূপে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর কতিপয় সন্দেহ ও প্রশ্নের জবাবে লিখিত এক নিবন্ধে তিনি বলেন ঃ

আমি একথা অবশ্যই বলব, আহমদী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা একটি আওয়াজ শুনেছে। কিন্তু এই বিষয়ের একটি বিহিত হওয়া দরকার, এই আওয়াজ কি ঐ মহান প্রভুর পক্ষ থেকে এসেছিল যাঁর হাতে রয়েছে জীবন ও শক্তি, না মানুষের আত্মিক শূন্যতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে যারা এই আওয়াজের জীব-জগত? তাদের এই আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা চাই এবং ঐ চিন্তাধারা ও আবেগের ওপরও যা এ আওয়াজ তার শ্রবণকারীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে।

পাঠকগণ, এ কথা মনে করবেন না, আমি রূপক ভাষা ব্যবহার করছি। অতীত জাতির জীবনেতিহাস বলে, যখন কোন জাতির জীবনে পতন শুরু হয়ে যায়, তখন পতনই ইলহামের উৎসগিরি হয়ে যায় এবং ঐ জাতির কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, সূফী, সাধক ও বুদ্ধিজীবীরা এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায় আর মুবাল্লিগদের এমন একটি দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে, যাদের একমাত্র উদ্দেশ্যই হয় ধাঁধা লাগানো কথার ঝুলি দিয়ে সংশ্লিষ্ট জাতির জীবনের ঐ অধ্যায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকা, যা অতিশয় ঘৃণ্য ও অপমানজনক।

এই মুবাল্লিগরা অবচেতনভাবে আশার সুন্দর মোড়কে হতাশাকে গোপন করে ফেলে এবং সুকীর্তির অব্যাহত ক্ষমতাকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়। এভাবে এক সময় তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিকে নস্যাৎ করে ফেলে।

এ সমস্ত লোক ইচ্ছাশক্তির ওপর সামান্য চিন্তা করুন যাদের এলহামের ভিত্তির ব্যাপারে এই পথনির্দেশ করা হয়ে থাকে, নিজেদের রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতাকে দৃঢ় মনে করে।

সুতরাং আমার ধারণায় ঐ সব অভিনেতা, যারা আহমদিয়াতের নাটকে অংশ নিয়েছে, পতন ও বিপর্যয়ের হাতে কাঠের পুতুল হয়ে রয়েছিল মাত্র।[১]

১. হরফে ইকবাল, পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৮।

ভাষাভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক জাহেলিয়াতের পরিণতি

[মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী কলকাতার মুসলিম স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের বিরাট সমাবেশে ১৯৭২ সালের ২৩শে মে এ ভাষণ দেন। এ সমাবেশে ছাত্রবৃন্দ ছাড়াও শিক্ষকমণ্ডলী ও শহরের শিক্ষিত মুসলমানরাও বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। কলকাতার জাকারিয়া স্ট্রীটের আমজাদিয়া হলে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। লেখক পরে ভাষণটি সম্পাদনা করে প্রবন্ধ আকারে প্রকাশ করেন।]

মানুষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়

বন্ধুগণ! আল্লাহ মানুষকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। তন্মধ্যে একটি নেয়ামত হচ্ছে, মানুষ তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগায়। পথে চলতে গিয়ে ঠোকর লাগলে সে ঝুঁকে পড়ে দেখে পায়ে কিসের ঠোকর লাগল? তারপর পথের সেই পাথরটিকে সরিয়ে দেয় বা সেটিকে এড়িয়ে চলে এবং কোন পথ এ ধরনের পাথরে পরিপূর্ণ অথবা অত্যধিক টেরা-বাঁকা হলে অন্য পরিষ্কার ও সোজা পথ অবলম্বন করে। যে যখন মারাত্মক ধরনের কোনো ভুল করে বসে অথবা কোনো ব্যাপারে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয় তখন তার কারণ অনুসন্ধান করে এ ব্যর্থতার রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করে। সে সব ভুলের জন্য তাকে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হলো ভবিষ্যতে এমন সব ভুলের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করে। কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণের এ প্রকৃতিগত যোগ্যতা মানুষের জন্য আল্লাহর দান। সাধারণ জীব-জানোয়ারের মধ্যে এ যোগ্যতা অনুপস্থিত। এরই কারণে মানুষ পরিপূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছে এবং মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতি, শিল্প ও জ্ঞান-বিজ্ঞান বিপুল উন্নতি লাভে সক্ষম হয়েছে।

ভুল না করা মানুষের জন্য প্রশংসার কথা নয়, ভুল মানুষের প্রকৃতি ও মজ্জাগত। হযরত আদম (আ.) থেকে এটি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। নিজের ভুল স্বীকার করা, সেজন্য লজ্জিত হওয়া, তার ক্ষতিপূরণ করা, তাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করা মানুষের জন্য প্রশংসনীয়। কোনো কোনো সময় নিজের ভুল ও পদস্খলনের জন্য সে এমন লজ্জা অনুভব করে এবং এত বেশি অনুতপ্ত হয়, তার ফলে মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করে যায়। তখন সে এমন স্থানে পৌঁছে যায় যেখানে ভুল করে তওবা করা ছাড়া কয়েক বছরেও পৌঁছতে পারত না। তার এই উন্নতি দেখে নিষ্কলংক চরিত্র ফেরেশতাদেরও হিংসা হয়। প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.)-ও ভুল করেছিলেন। কিন্তু তিনি এ ভুলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন নি, বরং এমন ভাষায়

এ ভুলের স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং এজন্য লজ্জা প্রকাশ করেছিলেন যার ফলে আল্লাহর রহমতের সমুদ্রে তুফান সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি প্রেমের এমন উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন যেখানে সম্ভবত পদস্খলনের পূর্বে আরোহণ করতে সক্ষম হন নি। তিনি বলেন ঃ

وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ -

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রাণের ওপর জুলুম করেছি। আর যদি তুমি আমাদেরকে মাফ না কর এবং আমাদের প্রতি করুণা না কর তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।' [সূরা আরাফ ঃ ২৩]

এই তওবা ও অনুতাপের ফলে তিনি উন্নতি লাভ করেন। কুরআন মজীদ নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁর ঘোষণাবাণী শুনিয়েছে ঃ

وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى - ثُمَّ اجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدٰى -

"আর আদম নিজের প্রতিপালকের হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করল। কাজেই সে পথভ্রষ্ট হলো। অতঃপর তার প্রতিপালক তাকে পুরস্কৃত করলেন, মেহেরবনী সহকারে তার প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং তাকে সোজা পথ দেখালেন।'

[সূরা তাহা ঃ ১২১,১২২]

অন্যদিকে শয়তানের ব্যাপারটি ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে নিজের ভুল ও নাফরমানীর ওপর প্রতিষ্ঠিত রইল এবং নিজের কাজের নির্ভুলতা ও বৈধতার জন্যে যুক্তি পেশ করল ঃ

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ -

"সে বলল ঃ আমি তার চাইতে উত্তম। আমাকে তুমি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ এবং তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে।" [সূরা আরাফ ঃ ১২]

ভুলের কারণে বহুতর সাফল্য

মানুষের উন্নতি, সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রসার ও ক্রমোন্নতিতে ভুলের অংশ সম্ভবত নির্ভুল পদক্ষেপ ও সঠিক পথে অগ্রসর হওয়ার চাইতে কম নয়, বরং মানুষের অনেক বিজয় ও সাফল্য ঐসব ভুলের কারণেই সম্ভব হয়েছে। মানুষের

নির্ভুল সিদ্ধান্ত ও যথার্থ কর্মধারার মাধ্যমে যেমন সে বহুতর সাফল্য অর্জন করেছে তেমনি অনেক ভুলের মাধ্যমে সে এক নবতর ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। এ দাবীর সমর্থনে ইতিহাসে অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। সিনাই উপদ্বীপে হযরত মুসা (আ.) নিরাপদে পৌঁছে যাওয়া ও ফেরাউনের সেনাবাহিনীর লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হওয়া হযরত মুসা (আ.) রাতের অন্ধকারে পথ ভুলে যাওয়ার ফল ছিল। নতুন জগতের (আমেরিকা) আবিষ্কার ছিল কলম্বাসের ভুল ও বিভ্রান্তির ফলশ্রুতি। ভারতবর্ষের সন্ধানে বের হয়ে ভুলক্রমে তিনি আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছলেন। ইতিহাসের পাতায় এমনি আরো বহু দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া যাবে।

ভুলের অনুভূতি না থাকা নির্মল স্বভাবসম্পন্ন মানুষের নীতি নয়

নিজের ভুল উপলব্ধি না করা, নিজের অভিজ্ঞতা ও ব্যর্থতাকে কাজে না লাগানো, ভুল ও ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান না করা, একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে থাকা ও একই গর্তে থেকে বার বার দংশিত হওয়া কোনো সুস্থ ও বিবেকবান ব্যক্তির লক্ষণ নয়, বিশেষ করে মুমিনের জন্য এ অবস্থা কোনোক্রমেই শোভনীয় নয়। কারণ আল্লাহ্ তাকে ঈমানী প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং তার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার জন্য সব চাইতে বেশি আহ্বান জানিয়েছেন। কুরআন মজীদ মুনাফিকদের দুর্বলতার বর্ণনা প্রসংগে বলেছে, তারা ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা থেকে মোটেই উপকৃত হয় না এবং বছরে কয়েকবার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ঃ

أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ -

"তারা কি দেখে না, তারা প্রতি বছর একবার দু'বার পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়? কিন্তু এরপরও তারা তওবা করে না কোনো শিক্ষাও গ্রহণ করে না।" [সূরা তওবা ঃ ১২৬]

মুমিনের এই যোগ্যতার প্রতি আস্থা প্রকাশ করেই একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين -

"মুমিনকে একই গর্ত থেকে দু'বার দংশন করা যায় না।"

ভাষাভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক জাহেলিয়াত

মাত্র কিছু দিন আগের ঘটনা। একটি প্রাচীন মুসলিম দেশ, যেখানে মুসলমানরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠ, যে দেশ ওলামা, মাশায়েখ, মাদ্রাসা ও খানকাহে পরিপূর্ণ ছিল, যে দেশের নগর-বন্দর, গ্রাম, গঞ্জ, মসজিদ ও আল্লাহর গৃহে ভরা

ছিল, যার জন্য শত শত বছর ধরে আওলিয়ায়ে কেরাম চোখের পানি ও কলিজার খুন প্রবাহিত করেন, যে দেশের মাটি তাঁদের অশ্রু সিঞ্চনে সিক্ত এবং যে দেশের আকাশ-বাতাস তাঁদের মধ্যরাত্রির ক্রন্দনে উত্তপ্ত, সেখানে জাতি, অঞ্চল, ভাষা ও সংস্কৃতির দানবের প্রচণ্ড তাণ্ডব শুরু হলো। দেখতে দেখতে শত শত বছরের পরিশ্রমকে ব্যর্থ ও অর্থহীন করে দিল। মুসলমান নিঃসংকোচে মুসলমান হত্যা করল। নিরপরাধ মানুষকে সাপ ও বিছার মতো নির্বিবাদে হত্যা করা হলো। তাদের প্রতি একটু দয়া প্রদর্শিত হলো না। যারা ওখানে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের জন্য ওদেশের কোথাও আর আশ্রয়স্থল ছিল না। কোনো অন্তরের অন্তস্থলে তাদের জন্য এক বিন্দু করুণাও ছিল না। কোনো চোখে তাদের জন্য এক ফোঁটা অশ্রু ছিল না। বনে-জঙ্গলে পশু, পাখি শিকার ও পুকুর-খাল-বিল নদীতে মাছ শিকারের ন্যায় মানুষ শিকার করা হচ্ছিল। মেয়েদের ইজ্জত আবরু সংরক্ষিত ছিল না। বৃদ্ধদের বার্ধক্যের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হলো না। নিরপরাধ শিশুদের চীৎকার ও কান্নাকাটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হলো না। নিজের ভাইয়ের জন্য ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট, নির্দয়তা ও হৃদয়হীনতার চরমতম নজীর প্রদর্শন করা হলো। ভাষা-পূজা তাওহীদ বিশ্বাসের ওপর, জাতি ও বংশ পূজা ইসলামী ঐক্যের ওপর এবং জাহেলী গর্ব, অহংকার ও বিদ্বেষ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ওপর এমনভাবে বিজয় লাভ করল যা ইসলামের প্রথম যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার কোনো অংশে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। ইসলাম ও মুসলমান ইতিপূর্বে কখনো কোথাও এমনভাবে পরস্পরের হাতে লাঞ্ছিত হয়নি। বলা বাহুল্য ইসলাম সর্বাবস্থায় জুলুম, নির্যাতন, হত্যা এবং গোত্রীয়, ভাষাভিত্তিক ও সাংস্কৃতিক সকল প্রকার জাহেলিয়াতের শত্রু–বাঙ্গালী বা বিহারী, আরব বা তুর্কী যে কেউ এর ধারক হোক না কেন। ইসলাম ভ্রাতৃহত্যা ও মুসলমানের রক্তপাতকে কুফরীর সমার্থক এবং সব চাইতে বড় গোনাহর কাজ গণ্য করে।

রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর বিদায় হজ্জের বিদায়ী ভাষণে বলেছিলেন, "দেখো, আমার পরে তোমরা সুস্পষ্ট কাফের হয়ে মরো না, তোমরা একজন অন্যজনের গলা কাটতে থেক না।" অথচ মুসলমানরা মহানবীর (সা.)-এর মহাবাণী সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছে।

সভ্যতার হাতে গড়া আর একটি মূর্তি

মানুষ যখন থেকে দুনিয়ায় বসতি স্থাপন করেছে তখন থেকে দুনিয়ায় বিভিন্ন ভাষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সমাজ ধারার প্রচলন হয়েছে। মানুষ হামেশা এদের ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করেছে। এদের কারণে জীবনের আনন্দ ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ্ মানুষের প্রতি তাঁর এ দানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۗىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۭ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ـ

"হে লোকেরা, আমি তোমাদের একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। তবে তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহকে বেশি ভয় করে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মর্যাদাশালী। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সব কিছু জানেন এবং সব কিছু সম্পর্কে সচেতন।" [সূরা হুজরাত ঃ ১৩]

অন্যত্র বলেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ ـ

"আর আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণসমূহ পৃথক হওয়া তাঁর (আল্লাহর) নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্যই জ্ঞানী বিচক্ষণ লোকদের জন্য এর মধ্যে নিদর্শনসমূহ রয়েছে।' [সূরা রুম ঃ ২২]

কিন্তু মানব জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সেখানে এ ধরনের সঙ্গিন ও বিষাদময় ঘটনাবলী ও হাস্যকর নাটকের প্রচুর সমাগম পরিলক্ষিত হলেও ভাষা ও সংস্কৃতির খাতিরে সংঘটিত কোনো যুদ্ধের সন্ধান পাওয়া যায় না। আরবরা তাদের বাকশক্তি ও ভাষাগত বিদ্বেষের জন্য বিখ্যাত, এমন কি তারা নিজেদের ছাড়া বাকি দুনিয়ার সমস্ত লোককে 'আজমী' অর্থাৎ বোবা বলত। এতদ্‌সত্ত্বেও আরবরা আজমীদের সাথে ভাষার ভিত্তিতে যুদ্ধ করেছে, ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনা লিখিত নেই। ইসলাম এ বিদ্বেষকে হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছিল। এর নাম দিয়েছিল 'জাহেলী হামীয়াত' বা জাহেলী গর্ব ও মর্যাদাবোধ। এর প্রতি কঠোর ঘৃণা প্রকাশ করেছিল। একে জাহেলিয়াতের ঘৃণ্য স্মারক, কুফরী ও মূর্তি পূজার সংগ্রাম এবং আল্লাহর ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামান্তর ঘোষণা করেছিল। এর পতাকাতলে মৃত্যুবরণ করাকে হারাম মৃত্যু বা জাহেলী ও অনৈসলামী মৃত্যু গণ্য করেছিল। কিন্তু জাহেলীয়াতের ইতিহাসেও ভাষার ভিত্তিতে এমন কোনো যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

এটি আসলে ইউরোপ ও তার চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের দান। ইউরোপের এ জাতীয়তাবাদই ভাষা ও সংস্কৃতিকে এ 'পবিত্র' আবরণ দান করেছে এবং একে এমন একটি মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে যার জন্য মানুষের বলিদান করা হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন দেশে প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষা, ভাষাগত বিদ্বেষ ও এজন্য প্রাণ উৎসর্গ কারার প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে। মানব জাতি ভাষার একটি নতুন 'ক্রুসেড' বা জাহেলিয়াতের (Paganism) সম্মুখীন হয়েছে। মানব জাতি ইতিপূর্বে কখনো এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। ইউরোপের এ প্রপাগান্ডা গভীর চিন্তা ও দূরদৃষ্টি সহকারে তৈরি করা হয়েছিল। যেসব মুসলিম জাতি অত্যন্ত নির্ভুল আকিদা, সুস্থ প্রকৃতি এবং দ্বীনী ও ঈমানী প্রেরণার অধিকারী ছিল এবং যাদের নিকট থেকে স্বাভাবিকভাবে আশা করা যেত, বরং যাদের প্রতি বিশ্বাস ছিল, তারা নিজেদের দীন ইসলাম ও সুস্থ প্রকৃতির কারণে কমপক্ষে দুনিয়ার অন্যান্য জাতির তুলনায় এই ভাষা-পূজা থেকে বহুদূর অবস্থান করবে, তাদের মধ্যে এ প্রপগান্ডা বিস্তার লাভ করে, অথচ এই ভাষা-পূজা আল্লাহর থেকেও কোনো সনদ ও দলিল-প্রমাণের অধিকারী নয় এবং আল্লাহর তুলাদণ্ডে এটি একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সরিষার দানার সমান মূল্যবানও নয়।

কিন্তু হঠাৎ মুসলিম জাহান এবং ইসলাম ও ইসলামী ঐক্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সম্মুখে একটি তুমি পরিস্থিতি দেখা দিল এবং একটি মুসলিম দেশের অন্তস্তল থেকে ভাষার ফিতনা আগ্নেয়গিরির ন্যায় বিস্ফোরিত হয়। এই বিপর্যয় সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ বা শয়তানের মুণ্ডপাত ও তাকে লাঞ্ছিত করার প্রেরণা কার্যকর ছিল না। ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির ধারা প্রবাহিত করা এবং সুকৃতির প্রসার ও দুষ্কৃতির বিলোপ সাধন এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এসব কিছুই এজন্য সংঘটিত হল, ঐ জাতির বিরাট অংশ ফিরিংগী যাদুকর ও জাতীয়তাবাদের চরমপন্থী পূজারীদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল এবং একটি ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে গিয়েছিল।

ইসলামের সুনাম ভীষণভাবে আহত

এই ব্যাপক নরহত্যা, মুসলমানের রক্ত পানির মতো প্রবাহিত করা ও ধন-প্রাণনাশের জন্য যত অশ্রু ঝরানো হোক না কেন, তা অনেক কম বিবেচিত হবে। কিন্তু এই ঘটনাবলীর সব চাইতে লজ্জাকর দিক হচ্ছে এই, এর ফলে ইসলাম-বিরোধীরা ইসলামের ব্যর্থতার সপক্ষে একটি প্রমাণ লাভ করেছে এবং তারা এর থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, ইসলামের মধ্যে সেতু বন্ধনের ও বিভিন্ন জাতি ও গোত্রকে (যাদের ভাষা, বর্ণ ও বংশ বিভিন্ন) ঐক্যবদ্ধ ও একীভূত করার যোগ্যতা নেই। উপরন্তু ইসলামী আকীদার ভিত্তিতে কোনো সমাজ ও রাষ্ট্র (State) প্রতিষ্ঠার ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর টিকে থাকার সম্ভাবনা নেই। এটি

একটি পরোক্ষ ক্ষতি হলেও অন্যান্য সমস্ত ক্ষতিই এর কাছে ম্লান। আপনারা ভারতের বিরাট ব্যবসার কেন্দ্রে বাস করেন, আপনারা জানেন, ব্যবসায়ীর নিকট লাভ-লোকসান, বাজারের ওঠানামা ও ব্যবসায়িক জোয়ার-ভাটার কোনো গুরুত্ব নেই। তার আসল পুঁজি হচ্ছে তার সুনাম ও তার প্রতি আস্থা। এ কারণে কোনো ফার্মের ট্রেডমার্ক অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী এবং হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তা খরিদ করা হয়। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ইসলামের সুনামকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। ইসলাম প্রচারকারীদের ও তাকে দুনিয়ার সব চাইতে বড় ঐক্যবদ্ধকারী শক্তি (Uniting force) হিসেবে পেশকারীদের জন্য একটি বিরাট বাধার সৃষ্টি করেছে এবং একদিক দিয়ে যে অতীত ইতিহাসের ওপর প্রত্যেক মুসলমান গর্ব করে তার সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহের বীজ বপন করেছে। আমাদের অতীত ইতিহাসে বলা হয়েছে, ইসলাম আরব-আজম, সাদা-কালো, কোরেইশী-হাবশী, এশীয়-আফ্রিকী, আমীর-ফকির, বাদশা-গোলাম, মাহমুদ ও আয়াজকে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। আমাদের নিকট এ ইতিহাস সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে সমগ্র বিশ্ব সর্বদা ইসলামের এই সাফল্যের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেছে। কিন্তু এখন আমরা কোন্ মুখে একথা বলব, ইসলাম তার অনুসারীদের মধ্যে এমন ঐক্য ও প্রেম-প্রীতির সৃষ্টি করে যার ফলে তারা ভাষা-বর্ণ-গোত্রের বিভিন্নতা বিস্মৃত হয়ে যায় এবং এক দেহ ও মিল্লাতে পরিণত হয়? এটিই হচ্ছে এই বিপর্যয়ের সব চাইতে দুঃখজনক ও শোকাবহ দিক। এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করার মতো শব্দ ও ভাষা আমাদের নেই এবং এজন্য রক্তাশ্রু প্রবাহিত করাও যথেষ্ট নয়।

রোগের বীজ

স্বীকার করি, রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের হাত সাফাই কতিপয় বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও আল্লাহদ্রোহী দলের রাজনৈতিক খেলা। কারণে এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে। সরলপ্রাণ জনসাধারণ এর শিকারে পরিণত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র জাতির ও দেশবাসীর এত সহজে ঐ সব রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের স্বার্থোদ্ধারের গুটিতে পরিণত হওয়া, এই বন্যায় খড়কুটোর ন্যায় ভেসে যাওয়া এবং তাওহীদ ও শির্ক, ইসলাম ও জাহেলিয়াত, গড়া ও ভাঙ্গা, বৃদ্ধি ও ভাবাবেগের মধ্যে পার্থক্য না করা নিছক একটি আকস্মিক ব্যাপার নয় এবং নিছক নেতৃবৃন্দের বুদ্ধিমত্তা, যোগ্যতা, জনতার সরলতা ও অজ্ঞতার ফলশ্রুতি নয়। কোনো দেশের কোনো যুগে কোনো আন্দোলন ততক্ষণ সফলকাম হতে পারে না যতক্ষণ জাতির মধ্যে তাকে গ্রহণ করার যোগ্যতা ও আগ্রহ পরিলক্ষিত না হয় এবং জাতির মন-মস্তিষ্কে তার ভিত্তি প্রথম থেকে প্রস্তুত না থাকে। যদি জাতি এ আন্দোলনের জন্য প্রথম থেকে প্রস্তুত না থাকে, তাহলে এ তুফান উঠে মাথার ওপর দিয়ে বয়ে যায়, বন্যা আসে এবং

চলে যায়। হিস্টিরিয়ারও প্রভাবও হয় সাময়িক এবং তা বেশিক্ষণ থাকে না। কিন্তু ঐ অবস্থার ও ঘটনাবলীর এতদিন পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকা ও ঐগুলোর ব্যাপকতা ও সাধারণ্যে প্রসার এ কথাই প্রমাণ করে, দেশে পূর্ব থেকেই এই রোগের বীজ বিদ্যমান ছিল এবং এ জাতির ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই এমন কিছু গলদ রয়ে গিয়েছিল যার ফলে আমাদের আজ এই দুর্দিনের মুখ দেখতে হলো।

যথার্থ চেতনার অভাব

আমাদের মতে এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, এ জাতির মধ্যে যথার্থ দ্বীনী চেতনার অভাব। মনের সাথে সাথে মস্তিষ্কেরও মুমিন হওয়া প্রয়োজন। কেবল ইসলামের প্রতি ভালোবাসা যথেষ্ট নয়। এই প্রসংগে ইসলামবিরোধী দর্শন ও দাওয়াতসমূহের প্রতি ঘৃণাও অপরিহার্য, বরং কুরআন মজীদে বহু স্থানে তাগুত (আল্লাহদ্রোহী শক্তি), শয়তান ও জাহেলিয়াতের আহ্বায়কদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও অসন্তোষকে আল্লাহর প্রতি ঈমানের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ م بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ط لَا انْفِصَامَ لَهَا -

"অতঃপর যে ব্যক্তি তাগুতকে (আল্লাহদ্রোহী শক্তি) অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল সে এমন একটি মজবুত সহায় অবলম্বন করল যা কখনো ছিন্ন হবে না।" [সূরা বাকারা ঃ ২৫৬]

ইসলামের প্রথম কালেমায় এ অস্বীকৃতিকে স্বীকৃতির পূর্বে স্থান দেয়া হয়েছে এবং 'ইল্লাল্লাহ'-এর আগে 'লা-ইলাহা' বলা হয়েছে। হাদীসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলমানের মধ্যে কুফরী ও কুফরীর নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও ভীতি সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে না এবং সে ঈমানের সত্যিকার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "তিনটি বিষয় যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে। এক. আল্লাহ ও রাসূলকে সে দুনিয়ার সব কিছুর চাইতে বেশি ভালবাসবে। দুই. কোনো মানুষকে সে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে। তিন. যখন আল্লাহ তাকে কুফরী থেকে নাজাত দান করেছেন তখন কুফরীর দিকে ফিরে যাবার ধারণা হতেই তার মনে এমন ঘৃণা ও ভীতি সৃষ্টি হবে, যেমন আগুনে নিক্ষেপ করার ধারণা থেকে হয়।" (বুখারী ও মুসলিম)

জাহেলিয়াতের যথার্থ পরিচয় জানা অপরিহার্য

মুসলমানের ইসলামের বিরোধিতা করার ও শত্রুর ক্রীড়নকে পরিণত হওয়া থেকে এতই সন্ত্রস্ত থাকা উচিত, স্বপ্নেও এ ধরনের কোনো ঘটনা দেখলে তার চীৎকার, তওবা ও এস্তেগফার করা উচিত। জাহেলিয়াতের প্রতি কেবল আবেগময় ঘৃণাই যথেষ্ট নয়, মুসলমানের জন্য জাহেলিয়াতের যথার্থ পরিচয় লাভ করাও প্রয়োজন। জাহেলিয়াতের ব্যাপারে যেন সে কখনো প্রতারিত না হয়। জাহেলিয়াত যদি কাবার গেলাফ গায়ে জড়িয়ে ও কুরআন মজীদ হাতে নিয়ে উপস্থিত হয় তবুও যেন সে 'লা হাওলা' পড়ে, তার হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়। যে কোনো পোশাকেই জাহেলিয়াত তার সম্মুখে আসুক না কেন, সে যেন তাকে চিনতে পারে। জাহেলিয়াতকে চেনবার মতো অন্তর্দৃষ্টি মুসলমানের থাকতে হবে।

শয়তানের কৌশল ও আক্রমণ পদ্ধতি

শয়তানের কৌশল ও যুদ্ধনীতি হচ্ছে, সে মুসলমানের মধ্যে যেদিক থেকে দুর্বলতা দেখে সেদিক থেকে আক্রমণ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিটি শ্রেণীর ওপর একই পদ্ধতিতে আক্রমণ চালায় না এবং একই অস্ত্র ব্যবহার করে না। দ্বীনদার ও আবেদদেরকে সাধারণ লোকের পর্যায়ের ফাসেকী ও দুষ্কৃতির জন্য উৎসাহিত করে না। কারণ এতে তার সাফল্যের আশা নেই। শয়তান তাদের মধ্যে রিয়া প্রদর্শনেচ্ছা, অহংকার, আত্মপ্রীতি, সম্মান-প্রতিপত্তির মোহ ও হিংসার ন্যায় বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। জাতির শির উঁচু করা, ক্ষমতা ও শাসন কর্তৃত্ব লাভ করা, অন্যের পরিবর্তে নিজেদের দেশের উপায়-উপকরণসমূহ নিজেরা ব্যবহার করা, নিজেদের ওপর নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা, নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধিশালী করা, যে কোনো মূল্যে নিজের দেশকে উন্নত করা.............. এ ধরনের সুদৃশ্য ও মনোমুগ্ধকর উদ্দেশে এবং হৃদয়গ্রাহী ও মধুর স্বপ্নের বেড়াজালে বিরাট জ্ঞানী ও শিক্ষিত ব্যক্তি আটকে পড়েন এবং অনেক সময় বড় বড় দ্বীনদার ব্যক্তিও এগুলোর মোহে অন্ধ হয়ে যান।

প্রতারণার জালে আরব জাতি ও তার শাস্তি

শয়তান আরবদেরকে এই সুখ-স্বপ্নই দেখিয়েছিল। তাদেরকে বলেছিল, কুরআন মজীদ তোমাদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহর নবী তোমাদের মধ্যে আগমন করেছেন, কাবাঘর ও সারা দুনিয়ার কেবলা তোমাদের দেশেই অবস্থিত, হারেম শরীফ ও আল্লাহর নবীর শেষ বিশ্রাম স্থান তোমাদের মাটিতেই রচিত হয়েছে, তোমরা কুরআন, হাদীস ও ইসলামে গভীর তত্ত্ব ও তাৎপর্য যেমনভাবে বুঝতে পার তেমনটি দুনিয়ার আর কোন জাতিই কি বুঝতে পারে? এতদ্‌সত্ত্বেও

খেলাফতের কেন্দ্র থাকবে তোমাদের থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে সমুদ্রের ওপারে কনস্ট্যান্টিনোপলে আর সেখানে থেকে তুর্কী জাতি তোমাদের ওপর শাসন চালাবে? অথচ এই তুর্কীদের ভাষা আরবী নয় এবং বংশও আরবী নয়!

এ যুক্তি অনেক আরবীদের মনে গেঁথে বসল। তাদের অনেকের মনে ছিল ক্ষমতা লাভের স্পৃহা। তারা দীর্ঘ দিন থেকে আরব সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখছিল। উপরন্তু তুর্কীদের বিরুদ্ধে তাদের অনেক অভিযোগ। তুকীদের বিরুদ্ধে প্রাধান্যের অনুভূতি ও শাসকসুলভ দৃষ্টিভংগীর কারণে অত্যন্ত বিরক্ত। কাজেই তারা তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। তারা বৃটিশ জুয়াড়ীদের স্বার্থোদ্ধারের ক্রীড়নকে পরিণত হলো। মক্কা শরীফে মুসলিম জাহানের কেন্দ্রস্থলে বসে এবং সিরিয়া ও ইরাকের আরবরা নিজেদের দেশে বসে মিত্রশক্তির সাথে সহযোগিতা করল। তাদের পরিকল্পনাকে পূর্ণতা পর্যন্ত পৌছে দেবার ব্যাপারে হলো সহযোগী। তুর্কীরা পরাজিত হলো। উসমানী খেলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটল। মুসলিম মিল্লাত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। পাশ্চাত্য শক্তিদের এখন আর কোনো ভয় ছিল না। মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোনো অঙ্গুলি সঞ্চালনকারীও ছিল না। এর ফলে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের জাতীয় আবাস ভূমি (National Home) ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো এবং আরবদের বুকের ওপর খোঁটার মতো গেড়ে বসল। বায়তুল মুকাদ্দাস ইহুদীদের করতলগত হলো। আরবরা যে জাহেলী বিদ্বেষের শিকার হয়েছিল এগুলো হলো তারই ফলশ্রুতি। এর ফলে তারা দু'দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

কুরআন ও হাদীসে জাহেলী গোত্র-প্রীতির নিন্দা

কোরআন ও হাদীসের একজন সাধারণ ছাত্রও একথা জানে, বংশ, গোত্র, রক্তধারা, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির ভিত্তিতে কারুর প্রতি অন্ধ সমর্থন ও দল গঠন এবং এগুলোর ভিত্তিতে ভালোবাসা ও ঘৃণা করা, সম্পর্ক গড়া ও সম্পর্ক ভাঙা, যুদ্ধ ও সন্ধি করা জাহেলী গোত্র-প্রীতির অন্তর্ভুক্ত। কুরআন ও হাদীসে এর নিন্দা করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

إِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ -

"যখন কাফেররা নিজেদের মনে জিদ ও অহংকার করল এবং জিদ ও অহংকারও ছিল জাহেলিয়াতের।" [সূরা আল-ফাতাহ ঃ ২৬]

উপরন্তু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "যে ব্যক্তি কোনো গোত্র-প্রীতির দিকে আহ্বান করে সে মুসলিম দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি কোনো কওম-প্রীতির জন্য মৃত্যুবরণ করে সেও মুসলিম দলভুক্ত নয়।" (আবু দাউদ)

একবার একজন মুহাজির ও একজন আনসার নিজের নিজের দলের দোহাই দেয় এবং মুহাজির 'ইয়া আলমুহাজিরিন', (হে মুহাজিররা) আর আনসার 'ইয়া আলআনসার' (হে আনসাররা)-এর স্লোগান দেয়। রসূলুল্লাহ (সা.) একথা শুনে তাদেরকে বললেন, "এই জাহেলী আহ্বানগুলো পরিহার করো। এগুলো নোংরা ও দুর্গন্ধময়।" (বুখারী)

রসূলল্লাহ (সা.) এই জাহেলী সম্পর্কসমূহকে, এগুলোর নামে আহ্বান জানানো ও এগুলোর দোহাই দেয়াকে এত বেশি ঘৃণা করতেন যে, যারা এগুলোকে কাজে লাগায় তিনি সর্বপ্রকারে তাদের হিম্মতহারা করার, তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও তিনি কখনো কোনো মহাশত্রুর জন্যও কঠোর ও কর্কশ শব্দ ব্যবহার করা পছন্দ করতেন না, তবুও এই জাহেলিয়াতের আহ্বায়কদের বিরুদ্ধে কঠোরতর ভাষা প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার সংকোচ করার ও ইশারা-ইংগিতের আশ্রয় নিতেও নিষেধ করেছেন। (দ্রষ্টব্য ঃ মিশকাত ২য় খণ্ড, আল ফাসলুস সানি, বাবুল মুফাখিরাতে ওয়াল আসাবিয়্যাহ)

ভাষা আল্লাহর রহমত না আজাব?

আসলে ভাষার বিভিন্নতা একটি আল্লাহ্‌প্রদত্ত ও সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত ব্যাপার, বরং কুরআন মজীদে একে আল্লাহ্‌র একটি দান ও ইলাহী শক্তির একটি নিশানীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ
وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ۔

"এবং আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করা তাঁর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর তোমাদের ভাষা ও বর্ণসমূহের বিভিন্নতার মধ্যে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের জন্য নিদর্শনসমূহ রয়েছে।" [সূরা আর রূম-২২]

কিন্তু যখন এই ভাষার ব্যাপারে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়, তার পবিত্রতা বর্ণনা করা আরম্ভ হয়, তাকে পূজা করা হয় এবং তার সম্মুখে ষষ্ঠাঙ্গে প্রণাম করা হয় তখন তা রহমতের পরিবর্তে আজাব এবং গড়ার মাধ্যম হবার পরিবর্তে ধ্বংসের মাধ্যম হিসেবে পরিণত হয়। তখন তার বেদীমূলে এমনভাবে

মানুষের বলিদান করা হয় যেমন এক সময় দেবতার বেদীমূলে মানুষকে পশুর ন্যায় বলিদান করা হতো। ভাষার সৃষ্টি হয়েছে ভাঙা মনকে জোড়া লাগাবার জন্য। ভাষার ভাণ্ডার থেকে উৎসারিত একটি শব্দ মৃতের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবে, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসার পুষ্প বর্ষণ করবে, অনাত্মীয়দের আত্মীয়, দূরকে নিকট এবং শত্রুকে বন্ধুতে পরিণত করবে। ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা, অনল বর্ষণ করা, ভাইকে ভাই থেকে আলাদা করা, ঘৃণার বিষ বাষ্পে বাতাস বিষাক্ত করা তার কাজ নয়। ভাষার সাহায্যে যদি এসব কাজ করা হয়ে থাকে, তাহলে এর চাইতে বোবা ও বাকশক্তিহীন হওয়া হাজার গুণ ভালো। এ অবস্থায় মানুষ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবে, দুনিয়ার সমস্ত জাতি ও সমস্ত মানুষ যদি বোবা হয়ে জন্মগ্রহণ করত এবং ইশারা-ইংগিতে আলাপ করত, তাহলে সম্ভবত তা মানবতার জন্য উত্তম ফলদায়ক হতো। তাহলে আর নিজের নিজের ভাষার অহংকার ও প্রেমে মত্ত হয়ে তারা নিরপরাধ মানুষের রক্ত প্রবাহিত করত না, মূক নারী ও নিরপরাধ-নিষ্কলংক শিশুদেরকে রক্তসাগরে স্নান করাত না এবং নিজেদের দেশকে অপমান, লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করত না।

ভাষার চাইতে মানুষের দাম বেশি

মানুষের জন্য ভাষা সৃষ্টি হয়েছে, ভাষার জন্য মানুষ সৃষ্টি হয়নি। ভাষা ও সাহিত্যের সমগ্র সম্পদ, হাজার হাজার মূল্যবান সাহিত্য, হাজার হাজার কবিতা গ্রন্থ ও অলংকার সাহিত্যের বিশাল সমুদ্রের চাইতে একটি মানুষের প্রাণের দাম অনেক বেশি। ভাষা জন্ম নিয়েছে, আবার মরে গেছে। ভাষা কখনো সংকুচিত হয়েছে, আবার সম্প্রসারিত হয়েছে। ভাষার চেহারার অনেক পরিবর্তন অনেক রূপান্তর হয়েছে। কিন্তু মানুষ চিরকাল মানুষই আছে এবং হামেশা মানুষই থাকবে।

দ্বীনী কর্ম ও চেতনার মধ্যে ভারসাম্যহীনতা

আমাদের একথা স্বীকার করা উচিত, আমরা দ্বীনী প্রেরণার ও ইবাদতের রুচি ও দ্বীনী তথ্য-জ্ঞান বৃদ্ধি করার জন্য যত অধিক চেষ্টা করেছি, দ্বীনের যথার্থ চেতনা লাভ ও এই চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য ততটা চেষ্টা করিনি। এর ফলে বহু মুসলিম দেশ দ্বীনী কর্ম ও চেতনার মধ্যে যথাযোগ্য ভারসাম্য দেখা যাচ্ছে না। এক ব্যক্তিকে দেখা যাবে অত্যন্ত দ্বীনদার, আবেদ ও তাহাজ্জুদ গুজার কিন্তু তার দ্বীনী চেতনা একেবারে কাঁচা, আনকোড়া ও শিশু পর্যায়ের। অনেক সময় দেখা যাবে, সে দ্বীনের মৌলিক চাহিদা সম্পর্কেও অজ্ঞ। সে এমন সব বড় ভুল করে বসবে যা কোনো সচেতন মুসলমানের পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। সে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের কোনো পার্থক্যই বুঝবে না এবং অতি সহজেই কোনো জাহেলী দাওয়াত ও প্রতারকের প্রতারণার শিকারে পরিণত হবে আর সেই

প্রতারক তাকে নিজের অসৎ উদ্দেশ্য ও ইসলামের শিকড় কাটার কাজে ব্যবহার করবে। সে অত্যন্ত সরল প্রাণে ও সদুদ্দেশে এই কার্য সম্পাদন করতে পারে এবং তার এই কার্য দ্বীনের চাহিদা ও দাবীসমূহের মধ্যে সে কোনো প্রকার বিরোধ ও বৈপরীত্যও অনুভব করবে না। ইসলামের ইতিহাসে এর অসংখ্য নজীর পাওয়া যাবে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এরই প্রকৃত নমুনা। দ্বীনী প্রেরণার দিক দিয়ে যেমন বাংলার মুসলমান হিন্দুস্থানের অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের চাইতে অনেক বেশি সুনামের অধিকারী ছিল, যাদেরকে আল্লাহ্তায়ালা দ্বীনের ব্যাপারে নরম দিল ও আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি করার মতো কোমল হৃদয়ের অধিকারী করেছিলেন, যারা দ্বীন ও দ্বীনী ঐতিহ্যসমূহের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করত, যারা দ্বীনী সভা-সমিতি ও ওয়াজ-নসীহতের মজলিসে বিপুল সংখ্যায় জমায়েত হতো এবং পতংগের ন্যায় সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তারা বহু স্থানে রাজনৈতিক জুয়াড়ীদের দুষ্ট বুদ্ধির শিকারে পরিণত হয়েছে, রক্তের হোলি খেলায় শরীক হয়ে গেছে এবং কমপক্ষে একটি সচেতন জাতিকে যে পর্যায়ের সাহসিকতা সহকারে ফিতনার মুকাবিলা করা উচিত সে পর্যায়ের সাহসিকতা সহকারে ঐ ফিতনার মুকাবিলা করতে পারেনি।

সাহাবায়ে কেরামের পূর্ণাংগ প্রশিক্ষণ

সাহাবাগণের ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদের পূর্ণাংগ ও ব্যাপক প্রশিক্ষণ ও তরবিয়ত দান করেছিলেন। এদিকে তাঁদের মধ্যে কর্মের এমন প্রেরণা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করা হয়েছিল যার দৃষ্টান্ত দুনিয়ার ইতিহাসে বিরল, অন্যদিকে তাদের মধ্যে এমন একটি চেতনা সৃষ্টি করা হয়েছিল, যার ফলে তাঁরা সব সময় ভুল ও নির্ভুল, জুলুম ও ইনসাফ এবং জাহেলিয়াত ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য করতে পারতেন। তাঁদের মন-মস্তিষ্ককে এমন সুস্থ, সরল ও ভারসাম্যপূর্ণ করে দেয়া হয়েছিল যার ফলে কোনো বিকৃত ও টেরা-বাঁকা জিনিস তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারত না। কোনো সোজা নলের মধ্যে যেমন কোনো বাঁকা জিনিস প্রবেশ করতে পারে না, তেমনি তাঁদের ভারসাম্যপূর্ণ মন-মস্তিষ্কও কোনো বাঁকা জিনিস গ্রহণ করত না।

আমি এর একটি সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী দৃষ্টান্ত পেশ করে থাকি। আপনারা জানেন, রসূলুল্লাহর (সা.)-এর সাথে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্ক কি ছিল এবং কেমন ছিল? এক কথায় বলা যায়, তওহীদের গণ্ডীর মধ্যে অবস্থান করে একজন মানুষের প্রতি একজন মানুষের যে পর্যায়ের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মানসিক সম্পর্ক হতে পারে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সাহাবায়ে কেরামের সম্পর্ক ঠিক ছিল সেই

পর্যায়ের। আল্লাহর পরে তাঁরা তাঁকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সত্তা মনে করতেন। তাঁরা জানতেন, তাঁর পবিত্র মুখনিসৃত যে কোনো বাণীর উৎস হচ্ছে আল্লাহ্র অহী, তাঁর হেদায়েত। তিনি প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী নিজের মন থেকে কথা বলতেন না। তাঁদের ঈমান ছিল ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى - اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى -

"আর না তিনি প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী মুখ থেকে কোনো কথা বলেন। এ (কুরআন) তো আল্লাহ্র হুকুম (তাঁর দিকে) পাঠানো হয়েছে।" [আন-নাজম ঃ ৩, ৪]

এ বৈশিষ্ট্য সম্মুখে রেখে এবার শুনুন ঃ একবার রসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবাগণের মজলিসে বললেন, তোমাদের ভাইকে সাহায্য করো জালেম অবস্থায়, মুজলুম অবস্থাও।"

ওপরে রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রতি সাহাবাগণের যে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথা বর্ণনা করা হয়েছে তার দাবী অনুযায়ী সাহাবাগণের বিনা বাক্য ব্যয়ে তাঁর কথা মেনে নেয়া ও তাকে কার্যকরী করা উচিত ছিল। এমন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দেবার ও আরবী ভাষাভাষী হবার পরও তাঁদের পক্ষে আরো কিছু জিজ্ঞেস করার ও এর ব্যাখ্যা চাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এতদিন তাঁদের যে পর্যায়ের তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল, রসূল (সা.)-এর পবিত্র মুখে তাঁরা জুলুমের যে নিন্দা শুনে আসছিলেন এবং জালেমের সহযোগিতা না করার জন্য তাঁদের যেভাবে নির্দেশ দিয়ে আসা হচ্ছিল, তার ও আজকের এ নির্দেশের মধ্যে তাঁরা সুস্পষ্ট বিরোধ ও বৈপরীত্য দেখতে পেলেন। তাঁরা নীরব থাকতে পারলেন না। আদবের সাথে আরজ করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল! মজলুম অবস্থায় তো সাহায্য করা যায় কিন্তু জালেম অবস্থায় কেমন করে সাহায্য করা যেতে পারে?" রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদের এ প্রশ্নে কোনো প্রকার বিরক্তি প্রকাশ করলেন না এবং তাঁদেরকে ধমকও দিলেন না, বরং তিনি হাসি মুখে নিজের এ ফরমানের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন ঃ হ্যাঁ, জালেমকেও সাহায্য করা যেতে পারে এবং করা উচিত কিন্তু এর পদ্ধতি কি? জালেমের সাহায্য হচ্ছে এই, তার হাত টেনে ধরো, তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখো। (বুখারী ও মুসলিম)

তাঁর এ ব্যাখ্যার পর বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেল।

স্রষ্টার নাফরমানী করে সৃষ্টির আনুগত্য জায়েজ নয়

এই চেতনার আর একটি দৃষ্টান্ত শুনুন। রসূলুল্লাহ (সা.) আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রা.) নামক জনৈক সাহাবীর নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি বাহিনী পাঠালেন। সীরাত ও ইতিহাসের পরিভাষায় এ ধরনের বাহিনীকে বলা হয় 'সারীয়া' বা ক্ষুদ্র বাহিনী। রসূলুল্লাহ (সা.) আবদুল্লাহ্‌র (রা.) সাথীদের নিজের আমীরের পূর্ণ আনুগত্য করার নির্দেশ দিলেন। একবার আমীর কোনো বিষয়ে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশটি পালন করতে সাথীরা একটু বিলম্ব করলেন। আমীর রাগান্বিতও হলেন। সাথীদের কাঠ জমা করার হুকুম দিলেন। কাঠ জমা হয়ে গেলে তাতে আগুন লাগালেন। একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হলো। তিনি সাথীদের ঐ অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার হুকুম দিলেন। সাথীরা অস্বীকার করলেন। তিনি সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা.) কি তোমাদের আমার আনুগত্য করার হুকুম দেননি? সাথীরা বললেন ঃ অবশ্যি দিয়েছেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, এই আগুন থেকে বাঁচার জন্য আমরা ইসলামে প্রবেশ করেছি এবং রসূলুল্লাহর (সা.) নেতৃত্বে গ্রহণ করেছি, এখন আমরা এর মধ্যে কেমন করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি? ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে গেল। অতঃপর এ বাহিনীটি মদীনায় ফিরে এলেন বাহিনীর আমীর রসূলুল্লাহ্‌র (সা.) আদালতে এ মামলাটি পেশ করলেন এবং নিজের সাথীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলেন। রসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাথীদের কর্মের প্রতি সমর্থন জানালেন এবং বললেন ঃ যদি তারা আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ত তাহলে আর কোনোদিন সেখান থেকে বের হতে পারত না। তিনি বললেন, "সৎ কর্মের ক্ষেত্রেই আনুগত্য বৈধ।" (বুখারী ও মুসলিম)

তিনি উম্মতকে একটি স্বর্ণোজ্জ্বল নীতি দান করেছেন। প্রতি যুগে এ নীতি মুসলিম উম্মতকে পথ দেখিয়ে আসছে। এ নীতিই প্রতিটি সংকটময় পরিস্থিতিতে জালেম ও একনায়ক (Dictator) বাদশাহদের অন্ধ আনুগত্য ও ভ্রান্ত পথে পরিচালনাকারী নেতৃবৃন্দের শর্তহীন সহযোগিতা থেকে মুসলিম জাতিকে বিরত রেখেছে। এ নীতিটি হচ্ছে, কোনো সৃষ্টির এমন আনুগত্য জায়েজ নয় যার ফলে স্রষ্টার (আল্লাহ) নাফরমানী হয় এবং তাঁর কোনো নির্দেশ ভঙ্গ হয়।" (সহীহ হাদীস ঃ মুসনাদে আহমদ ও মুসতাদরাকে হাকেম)

ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে প্রতিটি বিরাট বিরাট সংকটময় পরিস্থিতিতে মুসলমানরা নিজেদের মস্তিষ্কের ভারসাম্য ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার শক্তি বজায় রেখেছেন এবং তারা প্রতিটি ফিতনার অগ্নিকুণ্ডের ইন্ধন হতে রাজি হননি। তাদের মধ্যে এমন সব বিচক্ষণ, প্রাজ্ঞ, সংস্কারক ও আলেমের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে অস্বীকার করেছেন এবং বাতাসের

গতিমুখে চলতে রাজি হননি। কারবালার ময়দান থেকে যে ঘটনার উন্মেষ এবং কোন না কোন আকারে বর্তমানেও যার চেহারা দেখা যেতে পারে সে সব 'লা-তা আতা লিমাখলুকিনফী মায়াসীয়াতিল খালেক' (স্রষ্টার নাফরমানী করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য জায়েজ নয়)–এই স্বর্ণোজ্জ্বল নীতিরই ফলশ্রুতি।

আঘাতের উপশম

প্রিয় যুবক বন্ধুগণ। আঘাত অত্যন্ত গভীর। কিন্তু এমন কোন আঘাত নেই যার উপশম হয় না এবং যার নিরাময় সম্ভব নয়। এজন্য শর্ত হচ্ছে বুদ্ধি খাটানোর ও দৃঢ় সংকল্প করার। হারানো ধন খুঁজে পাওয়ার এবং পথ হারিয়ে বিপথে পরিচালিত কাফেলাকে ঘরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় ব্রতী হন। মুখের ভাষা থেকে যদি বিষ ছড়ানো হয়ে থাকে তাহলে বিষ নষ্টকারী মহৌষধও ছড়ানো যেতে পারে, বরং এ কাজটি প্রথমটির চাইতে অধিক সহজ ও বাস্তবসম্মত। কারণ ভাষা মানুষের মনকে জোড়া লাগাবার জন্য সৃষ্টি হয়েছে, তাকে ভাঙার জন্য নয়। ভাষা সৃষ্টির মূলে এটিই আল্লাহর হুকুম এবং এটিই বাস্তবসম্মত।

ভাষার ইসলামী প্রাণশক্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া বিপজ্জনক

কোনো ভাষা ও সাহিত্যের ইসলামী চিন্তা-ধারণা, ইসলামী বৈশিষ্ট্য ও পরিভাষাসমূহের সাথে পরিচিত না থাকা এবং দ্বীনী ইলমের ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। মন-মস্তিষ্ক ও হৃদয়-বিবেকের সাথে ভাষার নিকটতম সম্পর্ক বিদ্যমান। যে ভাষার ওপর অনৈসলামী চিন্তা ও অনৈসলামী সাহিত্যের আধিপত্য, যে ভাষার ওপর অনৈসলামী ছাপ সুস্পষ্ট, যে ভাষা-ভাষীদের চিন্তা-পদ্ধতি ও মনের কথা প্রকাশ করার পদ্ধতি ভিন্নতর, যে ভাষার উপমা, রূপক, প্রবাদ প্রভৃতি কোনো মুশরেকী সভ্যতার সংস্কৃতি বা দর্শন থেকে গৃহীত এবং তার মনীষীবর্গ, সাহিত্যিক ও কবি, তার সংস্কারক, আহ্বায়ক, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ সে ভাষাভাষীদের জন্য অনুসরণীয় ও আদর্শ বিবেচিত হয়। উপরন্তু যে পরিবেশে ইসলাম উৎপত্তি ও বিস্তার লাভ করেছে সে সম্পর্কেও যারা অজ্ঞ থাকে, তারা হামেশা চিন্তাগত ও সাংস্কৃতিক বিকৃতি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। তাদের জাহেলী গোত্রপ্রীতিকে হামেশা জাগ্রত করা হবে। জাতি-পূজা ও ভাষা-পূজার একটি স্লোগানই তাদেরকে পাগল করে দেবে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মধ্যে আমরা এরই নমুনা দেখেছি। এখন এই বিপদের গতিরোধ করা আপনাদের কর্তব্য : আপনারা ঐ ভাষা শিখুন এবং খুব ভালো করে শিখুন। ঐ ভাষা ও সাহিত্যকে কেবল ইসলামী চিন্তা দর্শনে ভরে তুললে হবে না, বরং তার প্রাণ ও বিবেককেও মুসলমান বানাতে হবে। তার প্রকৃতিকে ইসলামী বানাতে হবে। যে সব ব্যক্তি ও মনীষী তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে রাখে এবং মুশরেকী চিন্তা ও

দর্শনের নিকটবর্তী করে, তাদের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও চিন্তাগত প্রাধান্য খতম করার চেষ্টা করতে হবে। তাদের মধ্যে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের মধ্যে পার্থক্য করার, ইসলামকে ভালোবাসার ও জাহেলিয়াতকে ঘৃণা এবং ভাষা, জাতি ও দেশের দোহাই দিয়ে যেন তাদেরকে ইসলাম ও মুসলমানদের থেকে আলাদা করা সম্ভব না হয়।

নতুন যুগের উন্মেষ হবে

আল্লাহ্‌র সাহায্যে আপনারা এ দায়িত্ব সম্পাদন করতে সক্ষম হলে আমাদের আগের ভুল, যার ফলে এই অবাঞ্ছিত ঘটনাবলীর উদ্ভব হলো, একটি বিরাট সাফল্যের সূচনা করবে। মুসলিম মিল্লাতের একটি মূল্যবান অংশ, যার মধ্যে হাজার হাজার আলেম ও শত শত ওলী জন্ম নিয়েছেন, যাঁদের মধ্যে আজো ইসলামের প্রতি ভালবাসা ও দ্বীনের জন্য গর্ব ও মর্যাদাবোধ পরিলক্ষিত হয় এবং যাঁদের পূর্বপুরুষরা নিকট অতীতে উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ বীর মুজাহিদ হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদের (র.) নেতৃত্বে ইসলামের জন্য এমন সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে জিহাদ করেছেন যে, উইলিয়াম হান্টারের ন্যায় সমালোচকরাও বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়েন, তাঁরা আবার নতুনভাবে শক্তিশালী হতে সক্ষম হবেন। একটি নব যুগের সূচনা হবে।

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ - بِنَصْرِ اللّٰهِ ط يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ -

"আর সেদিন মুমিনরা খুশী হবে, আল্লাহ্‌র সাহায্যে, তিনি যাকে চান তাকে সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী ও করুণাময়।" [সূরা আর রূম ঃ ৪-৫]

অবক্ষয়ের উৎস

পাপের প্রবণতা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে

[মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী লক্ষ্ণৌ শহরের গঙ্গ প্রসাদ মেমোরিয়াল হলে ১৯৫৪ ইং সনের ৯ জানুয়ারী এই ভাষণ দেন। শহরের শীর্ষ ব্যক্তিবর্গসহ হিন্দু-মুসলিম শিক্ষিত মহলের একটি মিশ্র সভা ভাষণটির শ্রোতা ছিল।]

ইতিহাস পাঠ

আপনাদের অধিকাংশই ইতিহাস পাঠ করে থাকবেন। মানুষ আজকের নতুন কোন প্রাণী নয়। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের বিচরণ রয়েছে। তার কোটি বছরের ইতিহাস রয়েছে সংরক্ষিত। সে ইতিহাসের প্রবাহ পানির প্রবাহের মত সমান্তরাল নয়। তাতে রয়েছে ভীষণ উত্থান-পতন। সেই ইতিহাসের কোথাও মানুষকে উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীরূপে দেখা যায়, কোথাও অতি নীচু। কখনো মনে হয়, এ তো মানুষের ইতিহাস নয়, এ যেন রক্তচোষা হিংস্র জন্তুর ইতিহাস! মনে হয় এ ইতিহাস যার-তার, সকলের হতে পারে, কিন্তু মানুষের নয়। এ ইতিহাস অধ্যয়নে মানুষের মাথা নত হয়ে আসে; আমাদের মাঝে এমন সব মানুষও অতিক্রান্ত হয়েছেন! আপনারা ও আমরা কেমন মানুষ, এ সিদ্ধান্ত তো নেবে অনাগত প্রজন্মের লোকেরা। কিন্তু এ অনুমান আমরা করতে পারি মানুষের অতীতের রেকর্ড কেমন ছিল। সে সবের মাঝে এমন কিছু সময় ও পর্বও পরিলক্ষিত হয় যে, যদি সম্ভব হতো তাহলে ইতিহাস থেকে আমরা সে সব পৃষ্ঠা উপড়ে ফেলতাম। সেগুলো এমন রেকর্ড যে, আমরা শিশুদের হাতেও তা তুলে দিতে প্রস্তুত নই। আমার দায়িত্ব সেই ক্রান্তিকালের কাহিনী শোনানো নয়, বরং ইতিহাসে এ রকম যে সব অনাকাঙ্ক্ষিত পর্ব অতিক্রান্ত হয়েছে, তার মাঝে যাবতীয় অমঙ্গল ও অবক্ষয়ের শিকড় কী ছিল সেই আমোঘ বাস্তবতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

সমাজ ও সংস্কৃতির পচন

সাধারণত কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী অথবা কতিপয় ব্যক্তিও কখনো একা এক ব্যক্তিকেই সম্পূর্ণ সমাজের ও (Society) অবক্ষয়ের জন্য মানুষ দায়ী করে থাকে। মানুষ মনে করে, এই অসাধু গোষ্ঠী কিংবা এই বিভ্রান্ত ব্যক্তি জীবনের গতিকে এক ত্রুটিপূর্ণ লক্ষ্যে প্রবাহিত করে দিয়েছিল। কিন্তু এই ধারণার সাথে আমি অভিন্ন মত পোষণ করতে পারছি না। ইতিহাস অধ্যয়নের ওপর ভিত্তি করে আমি বলছি, একটি নষ্ট মাছ সম্পূর্ণ পুকুর পচিয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু একজন

মানুষ সমগ্র সমাজের অবক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে না। বাস্তবতা হচ্ছে ভালো সমাজে মন্দ লোকের অবকাশ থাকতে পারে না। সেখানে তার নিষ্কৃতি সম্ভব হয় না। হা-হুতাশ করে সে মারা যায়। তেমনি যে সমাজ ও সংস্কৃতি মন্দের উৎসাহ যোগায় না, সে সেই মন্দ লোকটিকেও স্বাগত (Welcome) জানাতে প্রস্তুত থাকে না। অসততা ও অবক্ষয় সেখানে তড়পাতে থাকে; তার শ্বাস ফুরিয়ে যেতে থাকে এবং এক সময় সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

প্রতিটি যুগেই ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ মানুষ ছিল। কিন্তু সকল মন্দের জন্য মন্দ লোকদের দায়ী করা এবং সকল মন্দ কর্মের দায় তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়। কিছু মন্দ লোকের প্রকাশ হলেও এর অর্থ এরূপ করা যায় না সম্পূর্ণ জীবনাচারের লাগাম তাদের হাতেই ছিল, তারা যেভাবে ইচ্ছা জীবন ও যিন্দেগীর গতি সেভাবেই ঘুরিয়ে দিত, বরং বিষয়টি হলো, খোদ সে সময়ের সমাজ ও সংস্কৃতির মাঝেই অবক্ষয় এসে গিয়েছিল। সেকালের আত্মা (Conscience) পচে গিয়েছিল। তার ভেতরে অন্ধকার ও অত্যাচার বেড়ে গিয়েছিল। রিপুর তাড়না পূরণের প্রবৃত্তি চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল জঘন্যভাবে, স্বার্থবাদী ও আত্মপূজারী হয়ে গিয়েছিল সমাজ। যে হৃদয়ে পচন ধরে যায়, যে মন পাপী হয়ে ওঠে, অপরাধ থেকে তাকে আপনি কোনভাবেই ফেরাতে পারবেন না। আপনি তাকে বেড়ি দিয়ে আটকিয়ে রাখলেও পাপাচার থেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবেন না।

স্বার্থপর মানুষ

প্রতি যুগেই এমন কিছু মানুষ ছিল যারা বিশ্বাস করত, শুধু আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজনই মানুষ আর অন্য সব মানুষ হলো আমাদের ভৃত্য-নফর। এমন কিছু মানুষও আছে, যারা কোটি মানুষকে বেঁচে থাকতে দেখে বটে, কিন্তু নিজেদের সীমাবদ্ধ একটি গোষ্ঠীকেই শুধু মানুষ গণ্য করে। মনে করে, সমগ্র পৃথিবীতে শুধু তাদের পরিবারের দশ-এগার কিংবা বিশ-পঁচিশজন মাত্র প্রকৃত মানুষ বসবাস করে।

সর্বকালেই এমন কিছু মানুষের সন্ধান মেলে, যারা নিজের সমস্যা ও নিজের আত্মীয়-স্বজন ও সংশ্লিষ্টদের দেখার ব্যাপারে অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকারী হয়। অন্যদের দেখার বিষয়ে তাদের চোখ বুজে আসে। কেউ কেউ আবার দু'রকম চোখের অধিকারী হয়। এক চোখে তারা নিজেদের দেখে। অন্য চোখে দেখে সমস্ত পৃথিবীটাকে। এদের কারুরই কোথাও মানুষ চোখে পড়ে না। আমার ধারণা, এদের কাছে সেই চোখই রয়েছে, যে চোখে এরা আপন শিশুকে আকাশের সাথে গল্প করতে দেখে, নিজের সামান্য তুচ্ছ জিনিসকে এরা পর্বত মনে করে আর অন্যের পাহাড়কেও মনে করে বিন্দু।

সংশোধনের বিচিত্র প্রস্তাব ও অভিজ্ঞতা

দুনিয়ার বিভিন্ন মানুষ যার যার ধারণা ও উপলব্ধি অনুযায়ী জীবন-শুদ্ধির পন্থা চিন্তা করেছে এবং তা কার্যকর করা শুরু করেছে।

কেউ বলেছে, সকল অবক্ষয় ও মন্দের মূল হচ্ছে মানুষের অভাব। পেট ভরে মানুষ খাবার খেতে পারছে না, এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যাধি। তারা এই বিষয়টিকে নিজেদের মিশন বানিয়ে নিয়েছে। ফলে পাপ আরো বেড়েছে। প্রথমে মানুষ ছিল দুর্বল। পাপও সে তুলনায় ছিল কমজোর। তারা যখন রক্তের ইনজেকশন দিয়েছে এবং জীবনী শক্তি (Vitality) বৃদ্ধি করেছে, তখন তাদের পাপও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। হৃদয় বদলায় নি, আত্মা বদলায় নি, বদলায় নি চেতনা। কিন্তু শক্তি বেড়ে গেছে, চেতনাহীনতা জন্ম নিয়েছে। পার্থক্য শুধু এতটুকু, পূর্বে ছেঁড়া পোশাকে পাপ হতো, এখন উজ্জ্বল ঝলমলে পোশাকে পাপ হচ্ছে। পূর্বে শক্তিহীন ও প্রজ্ঞাহীন হাতে পাপ হতো, এখন শক্তিধর ও প্রজ্ঞাবান হাতে পাপ হচ্ছে।

কেউ বলেছে, শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। মূর্খতা ও নিরক্ষরতাই অনিষ্টের শিকড় ও সকল মন্দের মূল কারণ। জ্ঞান বেড়েছে, মানুষ নতুন নতুন প্রজ্ঞা অর্জন করেছে এবং শিখেছে নতুন নতুন ভাষা। কিন্তু যাদের আত্মা নষ্ট, মস্তিষ্ক বক্র এবং হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত ছিল পাপ, তারা বিনাশ ও ধ্বংসের মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে জ্ঞানকে। সহজ কথা হলো, কামারের যোগ্যতা যদি চোরের অর্জিত হয়ে যায়, তাহলে সেই চোর তালা ভাঙতে শিখবে। এখন যদি কারো মাঝে আল্লাহভীতি ও মানবিক সহানুভূতি প্রবল না থাকে, অবিচার ও অত্যাচার তার স্বভাব হয়ে থাকে, তাহলে জ্ঞান তার হাতে অত্যাচার, দাঙ্গা ও বিপর্যয়ের উপকরণ তুলে দেবে। তাকে শেখাবে চুরি আর পাপের নতুন নতুন কলা-কৌশল।

কোন কোন লোক সংগঠনকে সংশোধনের উপায় মনে করেছে এবং তার সকল শক্তি ব্যয় করেছে মানুষকে সংগঠিত করার পেছনে। ফল হলো উচ্ছন্নে-যাওয়া ব্যক্তিদের একটি বিভ্রান্ত সংঘ সংগঠিত হলো। যে কর্ম এতদিন পর্যন্ত অসংগঠিতভাবে হচ্ছিল, এখন তা শুরু হলো সুসংগঠিতভাবে। এখন ষড়যন্ত্র ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে সংঘবদ্ধ চুরির ঘটনা ঘটতে লাগল। মানুষ চরিত্র সংশোধন, হৃদয় ও আত্মশুদ্ধির দিকে তো দৃষ্টি দেয়নি। ভালো-মন্দ লোকদের সংগঠিত করারই কর্ম মনে করেছে। ফল হয়েছে, চরিত্রহীনতার শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে। আমি বলব ডাকাত, চোর, সন্ত্রাসী ও চরিত্রহীনদের নিয়ে যদি বিপর্যয়ের সংগঠন না হতো তাহলে ভালই হতো।

কেউ বলেছে, ভাষার বিভিন্নতা অধিক সংকট ও বিপর্যয়ের মূল কারণ। ভাষা এক ও সম্মিলিত হওয়া উচিত। ভাষার অভিন্নতা হলো দেশের উন্নতি, জাতির অগ্রসরতা ও মানবতার সেবা। কিন্তু মানুষের চেতনার যদি পরিবর্তন না হয়, হৃদয়ের চাহিদা ও মনের প্রবণতাগুলো যদি না বদলায়, তাহলে ভাষার পরিবর্তন কিংবা বচন অভিন্ন হয়ে যাওয়ায় কি বিশেষ কোন্ উপকার হবে? কল্পনা করুন, যদি পৃথিবীর সকল চোর-অপরাধী অভিন্ন বচনে কথা বলে এবং একটি ভাষা বেছে নেয়, তাহলে পৃথিবীর কি লাভ হবে তাতে? এতে কি চৌর্যবৃত্তি আর অপরাধের দ্বার রুদ্ধ হবে? আমি কিন্তু মনে করি, চুরি ও অপরাধ কম হওয়ার স্থলে এ পরিস্থিতিতে তা আরো বেড়ে যাবে, এমন কি অপরাধী চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে এতে আরো জটিলতার সৃষ্টি হবে।

কেউ বলেছে, সময়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্ম ও মানবতার মহত্তম সেবা হলো সংস্কৃতি এক করে ফেলা। কিন্তু আপনাদের কি জানা নেই, এখানে সংস্কৃতির তেমন কোন লড়াই নেই? এখানে লড়াই হলো অহমিকার। পঞ্চাশের দশকের ভারতের অবস্থাকে আপেক্ষিক বিশ্লেষণে তুলে ধরতে গিয়ে তিনি এই কথাটি বলেছেন–অনুবাদক 'আমি ছাড়া কেউ কিছু না' এই ধ্বংসাত্মক অহংবোধ এখানে ঠোকাঠুকি করছে। আমাদের অনেক পথনির্দেশক নেতৃবর্গ ভাবনা-চিন্তা ছাড়াই বলতে শুরু করেছেন, যদি সমস্ত পৃথিবীর কালচার এক হয়ে যায়, তাহলে মানবতার তরী কূলের সন্ধান পাবে। যদি সমগ্র দেশের কালচার ও সংস্কৃতি এক হয়ে যায়, তাহলে এই দেশের অধিবাসীরা শান্ত ও পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বন্ধুগণ! সংস্কৃতির ঐক্য উপকারী কিছু নয়, উপকারী হচ্ছে হৃদয়ের ঐক্য। কবি ভুল বলেন নি–

'উত্তম মনের ঐক্য, ভাষার ঐক্যের চেয়ে।'

যদি মানুষ এক মনের না হয়, তবে ভাষার অভিন্নতা ও সংস্কৃতির ঐক্যে কোন লাভ নেই। যেসব লোকজন গোড়া থেকেই এক ভাষাভাষী এবং যাদের সংস্কৃতি এক ও সম্মিলিত, তাদের মাঝে কী এমন ভালোবাসা ও ঐক্য বিদ্যমান? তারা কি একে অপরের প্রতি অবিচার করে না? তাদের একজন অন্যজনের সঙ্গে কি প্রতারণা করে না? তাদের মাঝে কেউ কি অপরের তুলনায় ব্যর্থ ও বিচলিত নয়? এক কালচার, এক সংস্কৃতি ও একই ভাষার মানুষ কি পরস্পর লড়াই করছে না?

কেউ কেউ বলছে, পোশাক এক হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু যদি কোন মহারথীর অভ্যাস হয়ে যায় অন্যের কলার চেপে ধরার কিংবা পকেট কাটার, সে কি পোশাকের সম্মান করবে? সে কি শুধু এই কারণে তার ইচ্ছা পূরণ করা থেকে

বিরত থাকবে যে, তার মতো পোশাক অন্যের গায়েও ঝুলছে। মানবতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ যদি হৃদয়ে না থাকে, তবে পোশাকের প্রতি সম্মান আসবে কিভাবে? পোশাকের মূল্য ও মর্যাদা তো মানুষের কারণেই!

হৃদয়ের পরিবর্তনে জীবনের পরিবর্তন

মানুষ ও মানবতার যাবতীয় সমস্যা ও সংকটের সমাধান পোশাকের অভিন্নতা নয়, নয় ভাষা ও সংস্কৃতির সম্মিলন, নয় রাষ্ট্র ও দেশের ঐক্য, নয় জ্ঞান ও সম্পদ, নয় সংস্কৃতি ও সংগঠন, নয় উপায়-উপকরণের প্রাচুর্য। এই সবের মাঝে কোন একটাও এমন শক্তি নয় যা পৃথিবী পাল্টে দিতে পারে। হৃদয়ের জগত যতক্ষণ পর্যন্ত না বদলায়, বাইরের দুনিয়াও ততক্ষণ পর্যন্ত বদলাতে পারে না। সমগ্র পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হৃদয়ের মুঠোর ভেতর। জীবনের সকল অবক্ষয় ও ধ্বংস হৃদয়ের পচন থেকেই শুরু হয়েছে। লোকে বলে, মাছ মাথা থেকে পচতে শুরু করে। আমি বলি, মানুষের পচন হৃদয় থেকে শুরু হয়। এখান থেকেই অবক্ষয় ও পচনের সূচনা হয় এবং সম্পূর্ণ যিন্দেগীতে তা ছড়িয়ে পড়ে।

স্বভাব পাল্টে দিয়েছেন আম্বিয়া (আ.)-গণ

আম্বিয়া (আ.)-গণ এখান থেকেই তাঁদের কাজ শুরু করতেন। তাঁরা খুব ভালো করেই বুঝতেন. এসব কিছুই মূলত হৃদয়ের অপূর্ণতা। মানুষের মনের ভেতর পচন ধরেছে। মনের ভেতরে চুরি, জুলুম ও প্রতারণার প্রতি উৎসাহ ও স্পৃহা জন্ম নিয়েছে। তার ভেতরে রিপুর আধিপত্য রয়েছে, যা সর্বদা তাকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে আর সে শিশুর মতো তার ইঙ্গিতে ওঠা-বসা করছে। আম্বিয়া (আ.)-গণ বলেন, সকল মন্দের শিকড় হলো মানুষের পাপ তার মাঝে মন্দ কাজের প্রেরণা ও অকল্যাণের প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ সৃষ্টি হয়ে গেছে। তাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান কাজ হলো, তার আত্মশুদ্ধি ঘটানো হোক এবং হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন করা হোক।

মানুষকে তাঁরা ক্ষুধার্ত থাকতে দেখতেন। সেই দৃশ্য দেখে তাঁদের মন যে পরিমাণ ব্যথিত হতো, পৃথিবীতে অন্য কারুর মনে ততোটা ব্যথা হতো না। খানা-পিনা করা তাঁদের জন্য কঠিন হয়ে যেত। কিন্তু তাঁরা বাস্তবতাকে ভালোবাসতেন। তাঁরা সেটাকেই মূল সমস্যারূপে চিহ্নিত করে তার পিছু লেগে যেতেন না। কারণ তাঁরা জানতেন এটা অবক্ষয়ের ফল, মূল কারণ নয়। তাঁরা জানতেন, যদি লোকজনের উদর পূর্তির উপায় বের করে দেয়া হয় এবং অতিরিক্ত খাদ্য-খাবার ক্ষুধার্তদের হাতে তুলে দেয়া হয়, তবে তা একটি সাময়িক ও অস্থায়ী ব্যবস্থা হয়েই থাকবে। তাই তাঁরা এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করতেন যে, একজন মানুষের পক্ষে অন্য মানুষের ক্ষুধার চিত্র দেখাই যেন সম্ভব না হয়, বরং নিজ গৃহ থেকে খাদ্য নিয়ে লোকজনের মাঝে বিতরণ করতে শুরু করেন।

পক্ষান্তরে মানুষ এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে যে, খাদ্য কুক্ষিগত ও একই স্থানে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। মনে রাখবেন, যদি চেতনার পরিবর্তন না হয়, অথচ খাদ্য বণ্টন ও রসদের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়, তবে তারপরও মানুষের এমন কৌশল জানা আছে যে, অন্যের ঝুলির দানা নিজের ঝুলিতে চলে আসবে এবং চারদিক থেকে সম্পদ একত্র হয়ে নিজেদের পদতলে লুটিয়ে পড়বে। আপনারা সম্ভবত আলিফ লায়লার গল্প পড়ে থাকবেন। সওদাগর সিন্দাবাদ এক সফরে একবার এক স্থানে এসে দেখেন, জাহাজের কাপ্তান ভীষণ চিন্তিত ও অস্থির। সিন্দাবাদ কারণ জিজ্ঞাসা করলে জাহাজের কাপ্তান তাকে বলল, আমরা ভুলে এমন এক জায়গায় এসে পড়েছি, যার খুব নিকটেই চুম্বকের একটি পাহাড় রয়েছে। এখন থেকে অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের জাহাজ তার নিকটে পৌছে যাবে। চুম্বক লোহা আকর্ষণ করে। যখন সেই পাহাড় আকর্ষণ করবে, তখন জাহাজের সকল পেরেক ও কাঠের ভেতর গেঁথে থাকা লোহার কব্জাগুলো খুলে চলে যাবে সেই পাহাড়ে। জাহাজের বন্ধন তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আমাদের জাহাজ ডুবে যাওয়া থেকে তখন আর বাঁচতে পারবে না। ঘটনা এমনই ঘটল। চুম্বক লোহা আকর্ষণ করতে শুরু করল এবং জাহাজে মজুদ সকল লৌহজাত দ্রব্য ছিটকে খুলে গিয়ে চুম্বকের পাহাড়ের সাথে গিয়ে মিলে গেল। ফলে দেখতে দেখতে জাহাজ ডুবে গেল। ভাগ্যবান সিন্দাবাদ একটি কাঠের সাহায্যে কোনভাবে এক দ্বীপে আশ্রয় নিলেন এবং তার জীবন রক্ষা পেল।

এই গল্প মিথ্যা কিংবা সত্য যা-ই হোক, তা এখানে মুখ্য নয়। আপনাদেরকে আমার শোনানোর দায়িত্ব এটুকুই, আমাদের সমাজেও চুম্বকধর্মী পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী বিদ্যমান। আপনিও তাদের (magnate) বলে থাকেন। তারা এমন ষড়যন্ত্র করে রাখে যে, সম্পদ এক হয়ে তাদের ঘরে জমা হয়ে যায়। তারা এমন অর্থনৈতিক জাল বিস্তার করে আছে যে, লোকেরা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সব কিছু তাদের থলিতে তুলে দেয় এবং নিজেদের জীবনোপকরণ ও প্রয়োজনীয়তাগুলো তাদের হাতে সমর্পণ করে দিয়ে পুনরায় দারিদ্র্য ও ক্ষুধার জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। আম্বিয়া (আ.)-গণ হৃদয়ের প্রকৃতি পরিবর্তন করে দিতেন। তাঁরা মানুষের ভেতরে এমন পরিবর্তন সাধন করতেন যে, তারা অন্য মানুষের ক্ষুধার্ত মুখ দেখতেই পারত না। মানুষের অন্তরজগতে তাঁরা সৃষ্টি করতেন আত্মত্যাগের উদ্দীপনা, বিলীন হওয়ার প্রেরণা ও যথার্থ সহানুভূতির অঙ্কুর। অন্যের জীবন নিজের জীবনের চেয়ে অধিক মূল্যবান মনে হতো মানুষের কাছে। নিজের জীবন বিলীন করেও তখন তারা অন্যের জীবন রক্ষা করতে এগিয়ে আসত। নিজের শিশুদের ভুখা রেখে অন্যের পেট ভরে দিতে উদ্বুদ্ধ হতো। নিজেকে হুমকির মুখোমুখি করে অন্যকে হুমকিমুক্ত করতে ভালোবাসত।

ত্যাগের দু'টি ঘটনা

আমার এই কথাগুলো শুনে আপনারা অবাক হবেন না। এগুলো ইতিহাসের ঘটনা। আমাদের ও আপনাদের এই পৃথিবীতেই এমন হয়েছে। ইতিহাসে এমন সব ঘটনা বিবৃত হয়েছে, যা ফিল্ম কিংবা পর্দায় প্রদর্শিত অসংখ্য কল্প-কাহিনী থেকে অনেক বেশী অবাক করা ও বিস্ময়কর!

মুহাম্মদ (সা.) পৃথিবীতে আগমনের অল্পকাল পরের ঘটনা। এক মুসলমান তাঁর এক আহত ভাইয়ের সন্ধানে পানি নিয়ে বের হয়েছেন এ উদ্দেশে, পানির প্রয়োজন হলে তখন আমি তার সেবা করতে পারব। আঘাতপ্রাপ্ত ও আহতদের মাঝে তিনি তার ভাইকে পেলেন, অসংখ্য আঘাতে জর্জরিত ও প্রচণ্ড পিপাসায় অস্থির। তিনি পেয়ালা ভরা পানি তার সামনে এগিয়ে দিলে আহত ভাই অন্য এক আহত ব্যক্তির দিকে ইশারা করলেন, আগে তাকে পানি পান করাও। ঘটনার পরিসমাপ্তি যদি এখানে ঘটত, তাহলে মানবতার মহত্ত্বের জন্য তা যথেষ্ট হতো এবং তা ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনায় পরিণত হতো। কিন্তু ঘটনা এখানে শেষ হতে পারেনি। দ্বিতীয় আহত ব্যক্তির সামনের পানি ভর্তি পেয়ালা ধরা হলে তিনিও আরেকজনের দিকে ইশারা করলেন। এমনিভাবে প্রত্যেক আঘাতপ্রাপ্ত, আহত ব্যক্তি তাঁর পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির দিকে ইশারা করতে থাকলেন। অবশেষে চক্র শেষ হয়ে পেয়ালা যখন প্রথমজনের কাছে ফিরে এল, তখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে লোকান্তরে চলে গেছেন। দ্বিতীয়জনের কাছে পৌছতে তিনিও নীরব হয়ে গেছেন। এই ধারায় একের পর এক সেখানকার সকল আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিই দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। কিন্তু ইতিহাসের তাঁদের এক অমূল্য পদচিহ্ন রেখে গেছেন। আজ যখন ভাই ভাইয়ের পেট কাটছে, এক মানুষ অন্য মানুষের মুখ থেকে কেড়ে নিচ্ছে রুটির টুকরা, তখন এই ঘটনা অত্যুজ্জ্বল আলোকের এক আদর্শমণ্ডিত মিনার!

রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে একবার কয়েকজন মেহমান এলেন। তাঁর কাছে খাবার কিছুই ছিল না। তিনি ঘোষণা দিলেন, কে নিজের বাড়ীতে এদের নিয়ে যেতে চাও? সাহাবী আবু তালহা আনসারী (রা.) নিজেকে পেশ করলেন এবং মেহ্মানদের নিয়ে গেলেন। বাড়িতে খাবার ছিল কম। বাড়ির ভেতরে স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ হলো, বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হবে এবং মেহ্মানদের সামনে সব খাবার রেখে বাতি নিভিয়ে দেয়া হবে। পরে তাই হলো। মেহ্মানগণ পরিতৃপ্ত হয়ে খেলেন। অন্যদিকে আবু তালহা (রা.) হাত নেড়ে-চেড়ে ক্ষুধার্ত অবস্থায় উঠে পড়লেন। অন্ধকারে মেহমানগণ জানতেই পারলেন না, মেযবান খাবারে শরীক না হয়ে শূন্য হাত মুখ পর্যন্ত শুধু আনা-নেয়া করেছেন।

মানবতার বৃক্ষ সতেজ হবে ভেতর থেকে

মানুষের অন্তর্জগতে পরিবর্তন সাধন করতেন আম্বিয়াগণ। তাঁরা ব্যবস্থা পাল্টানোর চেষ্টা ততটা করতেন না, যতটা করতেন চেতনা বদলানোর কোশেশ। বিধি-ব্যবস্থা তো চেতনারই অনুগত হয়! যদি হৃদয় না বদলায়, চেতনা না পাল্টায়, তাহলে কিছুই পাল্টায় না। মানুষ বলে দুনিয়া খারাপ, সময় খারাপ। আমি বলি, এগুলো কিছুই নয়, বরং খারাপ হলো মানুষ। মাটির অবস্থার ভেতরে কি কোন পরিবর্তন হয়েছে? বাতাসের প্রভাব কি বদলে গেছে? সূর্য কি উত্তাপ ও আলো বিকিরণ বর্জন করেছে? আকাশের অবস্থার কি পরিবর্তন এসেছে? কোন্ বস্তুটির স্বভাবে (Nature) পরিবর্তন হয়েছে?

মাটি তো একই রকমভাবে স্বর্ণ উদ্‌গিরণ করছে; তা ভেদ করে উৎপন্ন করছে শস্যের ভাণ্ডার, ফলমূলের স্তূপ। কিন্তু বণ্টনকারী পাপী হয়ে গেছে। এই অত্যাচারীরা যখন নিজেদের প্রয়োজনীয়তার তালিকা তৈরি করে, তখন কাগজের স্তূপও তাদের যথেষ্ট হয় না। অন্যদিকে যখন অন্য লোকজনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে ভাবে, তখন যাবতীয় অর্থনৈতিক প্রজ্ঞা সে তালিকা সংকুচিত করার ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়। এই প্রবণতা যতদিন না পাল্টাবে, মানবতা ততদিন আর্তনাদ করতে থাকবে। আম্বিয়াগণ হৃদয়রাজ্যে ইঞ্জেকশান দিয়েছেন, লোকেরা বহিরাবরণ টিপটপ করছে এবং তাতেই সকল সামর্থ্য ব্যয় করছে। আম্বিয়াগণ অন্দর রাজ্য নিয়ে ভেবেছেন, ভেতরে অস্ত্রোপাচার করেছেন।

আজ সমগ্র পৃথিবীতেই ভেতর থেকে মানবতার বৃক্ষ শুকিয়ে যাচ্ছে। তার উদর ফাঁপিয়ে তুলছে ঘুণ ও উই পোকা। কিন্তু কালের চিকিৎসকরা ওপর দিয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে পানি। বৃক্ষের অন্তরের সতেজতা ও তার বর্ধনশক্তি প্রতি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, অথচ প্রায় মৃত সেই বৃক্ষের পাতাগুলোকে সবুজ-সতেজ রাখার জন্য বায়ু (Gases) প্রবাহিত করা হচ্ছে, পানি ছিটানো হচ্ছে, যাতে শুকিয়ে যাওয়া গাছ-পাতা শ্যামল হয়ে ওঠে। আম্বিয়াগণ এই ব্যর্থ চেষ্টার পরিবর্তে মানুষকে মানুষ বানানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। মানুষের হৃদয়ে তাঁরা ঈমানী ইঞ্জেকশান দিয়ে গেছেন এবং ঘোষণা করেছেন, হে আত্মভোলা মানুষ! আপন স্রষ্টাকে জেনো এবং ঘুমে-জাগরণে, চলতে-ফিরতে তাঁকে পর্যবেক্ষকরূপে গ্রহণ করো যাঁর তন্দ্রা বা নিদ্রাও আসে না।

মানবতার যথার্থ পথনির্দেশক

মানুষের হৃদয় ও আত্মা থেকে যতক্ষণ পর্যন্ত ভালোবাসার ঝর্ণা না ছুটবে, মনের ভেতরে না জন্মাবে আত্মত্যাগের প্রেরণা, মানবতার সংশোধন ততক্ষণ পর্যন্ত অসম্ভব। তাই তাঁরা এমনি মানবিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছেন যে,

তার ফলে অন্য ভাইয়ের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা এবং কষ্ট বরণ করার স্পৃহা জেগে ওঠে। নিছক আইনের সাহায্যে তাঁরা মানুষের চিকিৎসা করেন নি, বরং মানুষের ভেতরে প্রকৃত মানবতা ও মানবতার প্রাণ প্রবাহ সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা এমন জাতি সৃষ্টি করেছেন, যে জাতি মানবতার প্রদর্শনী (Demonstration) করে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে, আমরা ভুঁড়ি, উদর আর মাথার দাস নই। তারা পরিস্থিতি ও কর্মের ভাষায় ঘোষণা করেছে, পেট, আবেগ, সম্পদ, শাসক ও আত্মীয়-পরিজনের পূজারী তারা নয়। এমন জাতির উদ্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত না হয়, মানবতার সংশোধন ও উত্তরণ ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয়।

যদি কোন দেশে এমন জাতির জন্ম হয় যারা নিজেদের ভুলে গিয়ে সকলের কল্যাণ করবে তাহলে তার দ্বারা সম্ভব হবে মানবতার সংশোধন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মানবতার অনেক বড় বড় কল্যাণকামীই অতিবাহিত হয়েছেন কিন্তু কোন না কোন ধাপে এসে আপনি দেখবেন, তারা নিজেদের আখের গুছিয়ে ফেলেছেন। জাতির এমন বহু সেবক অতিবাহিত হয়েছেন, যারা জাতিশুদ্ধির কাজ করেছেন বড়ই দুঃসময়ে, জেল খেটেছেন; কিন্তু অবশেষে কারাগার থেকে বের হয়ে এসে শাসকের মসনদে আরোহণ করেছেন। সেটা তাদের প্রাপ্য ছিল হয়তো। সেজন্য তাদের ধন্যবাদ।

আম্বিয়াগণের যিন্দেগী

কিন্তু আল্লাহর আম্বিয়াগণ আত্মত্যাগ করেছেন স্বার্থহীনভাবে। পৃথিবীর শান্তির স্বার্থে তাঁরা আপন আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়েছেন। তাঁরা এক শত ভাগ অন্যের উপকারের জন্যে কষ্টকর জীবন যাপন করেছেন, নিজেদের লাভ এক ভাগও ওঠান নি। তাঁদের সাহাবী-সহচররা যে পথে চলেছেন, পৃথিবী উদ্ভাসিত করে তুলেছেন। তাঁদের লাগিয়ে যাওয়া বাগানের ফল পৃথিবী আজও ভোগ করছে; সে বাগান তাঁরা সজীব করে তুলেছেন নিজেদের তপ্ত খুন সিঞ্চিত করে। তাঁরা অন্যের ঘর আলোকিত করেছেন প্রদীপের সাহায্যে, কিন্তু মৃত্যুর সময় পর্যন্ত নিজেদের ঘরগুলো ছিল আলোর সুবিধা থেকে বঞ্চিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন। মুহাম্মদ (সা.)-এর দিয়ে যাওয়া আলোয় গরীবের ঝুপড়ি আর শাহী প্রাসাদ একইভাবে ঝকমক করেছে, কিন্তু ওফাতের প্রাক্কালে তাঁর ঘরের বাতি চেয়ে-আনা তেলের বিনিময়ে জ্বলেছে, অথচ তখন মদীনার হাজার হাজার ঘরে তাঁরই হাতে প্রজ্জ্বলিত বাতির অনির্বাণ শিখা জ্বলছিল। তিনি বলতেন ঃ

"আমরা আম্বিয়াগণ কারুর উত্তরাধিকারী হই না, আমাদেরও কোন উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যা কিছু রেখে যাই, তা গরীবের হক।"

এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ তাঁর আরেকটি ঘোষণা হলো ঃ যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে এবং কিছু রেখে গিয়ে থাকে, তা তার উত্তরাধিকারীদের ধন্য করুক! আমরা তা থেকে এক পয়সাও নেব না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঋণ রেখে গেছে, তা আমাদের দায়িত্বে থাকবে।

দুনিয়ার কোন শাসক বা নেতা কি এই আদর্শ রেখে গেছেন? তাঁর জীবন হলো মানবতার উজ্জ্বল কীর্তি। তিনি পৃথিবীর সামনে এমন আদর্শ তুলে ধরেছেন যাতে আত্মোৎসর্গ, প্রেম ও অন্যের বেদনায় ব্যথিত হওয়ার পরিবর্তে কোথাও একরত্তি পরিমাণও আত্মস্বার্থের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। আরবের একমাত্র বাদশাহ তিনি ছিলেন, যাঁর সাম্রাজ্য ছিল মানুষের হৃদয়রাজ্যে বিস্তৃত। কিন্তু দুনিয়া থেকে আস্তিন বাঁচিয়ে নির্ভোগ তিনি চলে গেলেন। তিনিই শুধু নন, যিনি যতো তাঁর নিকটবর্তী ছিলেন, তিনি ততো ঝুঁকির নিকটবর্তী ও লাভ থেকে দূরে ছিলেন। নিজের গৃহিণীদের ঘোষণা করে বলে দিয়েছেন, যদি দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ চাও, তবে যৎসামান্য কিছু দিয়ে আমি তোমাদেরকে বিদায় দিয়ে বাড়িতে রেখে আসব। সেখানে তোমরা ফিরে যাও এবং সুখ-শান্তির জীবন কাটাও। আমার কাছ থেকে বিচ্ছেদ বরণ করে নাও। আমার সাথে থাকতে হলে দুঃখ-সংকট বরদাশ্ত করতে হবে। এই ছিল সেই আদর্শের উপহার। এর প্রতিই আল্লাহর পুরস্কার অবতারিত হয়।

আমরা চাই পুনরায় এই যিন্দেগী ব্যাপকতা লাভ করুক! মানবতার স্বার্থহীন সেবা ও উদ্দেশ্যমুক্ত ভালোবাসার প্রচলন হোক! আবারো অন্যের কল্যাণে নিজের ক্ষতি গ্রহণ করে নেয়া হোক এবং পুনরায় এমন জাতির জন্ম হোক, বিপজ্জনক মুহূর্তে যারা এগিয়ে আসে এবং লাভের সময় পিছিয়ে থাকে।

চাহিদা পূরণ শান্তির পথ নয়

আজ দুনিয়ার সকল ক্ষমতা ও প্রশাসন এই এক বৃত্তের ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে, জাতি-গোষ্ঠী ও শ্রেণীসমূহকে সার্বিকভাবে তুষ্ট রাখা হোক এবং চাহিদা মাত্রই পূরণ করা হোক! কিন্তু জ্ঞানী বন্ধুরা! সংশোধন ও পরিমার্জনের পথ এটা নয়। এখানে একজন মাত্র মানুষের চাহিদাও পূরণ করা দুষ্কর। চাহিদার অবস্থা হলো এই, তা অসীম ও অশেষ, অথচ দুনিয়াটা সীমিত, সংক্ষিপ্ত এবং কোটি মানুষের জন্যে সম্মিলিত। ইতিহাসের জগতটা যদি দেখা হয়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে এই পৃথিবীর মাত্র একজন মানুষেরও মুখে চাওয়া চাহিদা পূর্ণ করার অবকাশ নেই। এখানে কোন আবদারকারীর আবদারই পূরণ হতে পারে না। এখানে প্রবৃত্তি তোষণে আগ্রহীরা ডেকে ডেকে বলে ঃ

পাপের সমুদ্র পানি শূন্যতায় শুকিয়ে গেল,
আমার আঁচলের কোণটাও তো এখনো ভিজল না!

আজ পৃথিবীর বড় বড় নেতা একথা বলছেন, মানবিক চাহিদা সবই বৈধ ও স্বাভাবিক। সব চাহিদা পূরণ হওয়া উচিত। বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে এটাই কার্যকর হচ্ছে।

মৌলিক ত্রুটি এটিই। চাহিদা ও প্রবৃত্তি মেটানো ও পূরণ দ্বারা মানবতার উত্তরণ হতে পারে না। চাহিদা পূরণ দ্বারা চাহিদা কমে যাবে না এবং হৃদয়ে প্রশান্তি জন্মাবে না। এটাতো সমুদ্রের পানি। এর সাহায্যে পিপাসা যতই মেটানো হবে, পিপাসা ততই তীব্র হতে থাকবে। আজ সমগ্র পৃথিবীর প্রশাসন, প্রতিষ্ঠান ও সংস্কৃতি এই দর্শনকে অবলম্বন করেই কাজ করছে। মানুষের শুদ্ধ-অশুদ্ধ চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা হোক। জাতি, শ্রেণী, জনতা ও ব্যক্তিরা চাইবে, তা-ই দেয়া হোক। এতে শান্তি আসবে। নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু ফলাফল হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত। আজ সব দিকেই আগুন লেগে গেছে। আত্মার আগুন কিছুতেই নেভে না। প্রবৃত্তির একটি সলতে জ্বলে চলেছে। সকল জাতি তাতে ইন্ধন ও বাতাস দিয়ে যাচ্ছে। সেই সলতের দাউ দাউ অগ্নিশিখা আজ আকাশের সাথে কথা বলছে। জাতি ও রাষ্ট্রের দিকেও তা এগিয়ে আসছে। আজ 'দোযখের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর' আয়াতের এই মর্মের দৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। মানুষ এ আগুনের অভিযোগ ওঠাচ্ছে। কিন্তু ভাববার বিষয় হলো, এ আগুন কে জ্বেলেছে? কে তাতে তেল ছিটিয়েছে? কে যুগিয়েছে ইন্ধন? পূরণের পথের এটাই পরিসমাপ্তি ও গন্তব্য।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, যারা জাতির সকল প্রবৃত্তি ও দাবী পূরণকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন এবং সাথে সাথে তাদের বিনোদন ও প্রসন্নতার উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করাও দরকারী ভাবেন, তারা নিজেদের সন্তানদের সাথে কিন্তু এই আচরণ করেন না। সন্তানের বহু ভুল ও ক্ষতিকর চাহিদা তারা অপূর্ণ মনে করেন এবং সাথে সাথে তাদের বিনোদন ও প্রসন্নতার উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করাও দরকারী ভাবেন, তারা নিজেদের সন্তানদের সাথে কিন্তু এই আচরণ করেন না। সন্তানের বহু ভুল ও ক্ষতিকর চাহিদা তারা অপূর্ণ রাখেন। শিশুরা যদি আগুন নিয়ে খেলতে চায়, তাহলে তাদের খেলতে হয় না। কিন্তু জাতির সকল চাহিদা ও দাবী পূরণে তারা প্রস্তুত। তাহলে এরা যা করছেন, তাতে কি অনুমিত হয় না, নিজের দেশবাসী বা সাধারণ মানুষের সাথে আপন সন্তানতুল্য সহানুভূতি এদের নেই? এই লোকেরাই বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতির ও"র শাসন চালান, তাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য এবং জনগণের বায় লাভের স্বার্থে সকল শুদ্ধ-অশুদ্ধ চাহিদা পূর্ণ করা অপরিহার্য মনে করেন। আজ কোন দেশেই এমন কোন দল নেই এবং কোন ব্যক্তির মাঝেও এই চারিত্রিক সৎ সাহস নেই যে, তারা বিনোদন ও বিলাসিতার সমালোচনা করবেন; খেল-তামাশার

ক্রমবর্ধমান আগ্রহ, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র ও ফিল্মায়নের সীমাতিরিক্ত উৎসাহ ও স্পৃহার প্রতি প্রশ্ন উত্থাপন করবেন। আজ এমন কোন রাষ্ট্র নেই যে রাষ্ট্র এই বিষয়গুলোর ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে এবং জাতি ও দেশবাসীর অসন্তুষ্টি বরণ করে নেবে।

চাহিদার মাঝে ভারসাম্য সৃষ্টি ও সঠিক চেতনার জাগরণ

আল্লাহর আম্বিয়াগণের পথ উপরিউক্ত পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা বৈধ-অবৈধ চাহিদা পূরণের পরিবর্তে চাহিদার ওপর মাত্রা লাগিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা চাহিদার গতি পাল্টিয়ে দিয়েছেন এবং শুধু বৈধ চাহিদাগুলোকে পূরণের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করেছেন। জীবন্ত ও জাগ্রত অন্তর তাঁরা সৃষ্টি করেছেন। এতে জীবনে ভারসাম্য ও হৃদয়ে প্রশান্তি সৃষ্টি হয়েছে। তোমাদের বিদ্যালয়, পরীক্ষাগার, গবেষণাক্ষেত্র (Laboratories), তোমাদের বিজ্ঞান পৃথিবীকে অনেক কিছু দিয়েছে। বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহ এ সবের অবদান। কিন্তু এগুলো মানুষকে পবিত্র একটি হৃদয় উপহার দিতে পারেনি। তোমাদের এই প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের হাত খুলে দিয়েছে। শিশুদের হাতে তুলে দিয়েছে হাতিয়ার। কিন্তু তাদের যথার্থ প্রশিক্ষণ হয়নি। আজ সেই অশিক্ষিত শিশুর দল আমোদ-প্রমোদ করে সেই হাতিয়ারগুলোর স্বাধীন ব্যবহার করে চলেছে।

আল্লাহর আম্বিয়াগণের চাহিদার ওপর প্রহরী বসিয়েছেন। চাহিদার মাঝে পরিমাপ ও ভারসাম্য সৃষ্টি করেছেন। রিপুতাড়িত চাহিদার পরিবর্তে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার এক মহান চাহিদার জন্ম দিয়েছেন। মানবিক সহানুভূতি ও সমবেদনার প্রেরণা সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা বস্তু আবিষ্কার করেন নি। কিন্তু এমন মানসিকতা তাঁরা সৃষ্টি করেছেন, যা দ্বারা আল্লাহপ্রদত্ত মানুষের তৈরিকৃত বস্তু ব্যবহারের যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে। তাঁরা হৃদয় দিয়েছেন, বিশ্বাস দিয়েছেন। আজ পৃথিবীর কাছে সব কিছু আছে, বিশ্বাস নেই। আজ পৃথিবীর শিল্প-কারখানা সব কিছু উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু একীন ও বিশ্বাস অর্জিত হয় আম্বিয়াগণের কারখানা থেকে। পৃথিবী আল্লাহভীরু লোকশূন্য। মানবতার স্বার্থহীন সেবা কে করবে? অথচ আল্লাহভীতি ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বিশ্বাস মানবতার নিঃস্বার্থ সেবায় উৎসাহিত করে। মানবতার এমন সেবকরা সকল স্লোগান, রাষ্ট্র শাসনের মোহ, রাজনৈতিক চাল ও রাজনৈতিক ভাঙ্গা-গড়া থেকে বিমুখ ও প্রতিক্রিয়াহীন থেকে নিঃস্বার্থ সেবা করে যান। আজ এমন সেবকের প্রয়োজন, যাদের কাছে কিছুই নেই, তারপরও কিছু নিতে চায় না, বরং চায় আরো দিতে।

শেষ আহ্বান

আমরা মানুষের মাঝে এই আবেগ সৃষ্টি করতে চাই এবং বাস্তবতার তৃষ্ণা জাগাতে চাই, জীবন শুধু খানাপিনার নাম নয়। মানুষের জীবন নিছক বস্তুকেন্দ্রিক অথবা জান্তব জীবনের নাম নয়। আমরা এক নতুন স্বাদ ও রুচি নিয়ে এসেছি। আজকের বস্তুতান্ত্রিক পৃথিবীতে এ কথা নতুন। অবশ্য এক অর্থে এ কথা নতুন নয়। পৃথিবীর সকল আম্বিয়া এই পয়গাম নিয়েই এসেছেন এবং সবচেয়ে বেশী দৃঢ়তা ও স্পষ্টতার সাথে মুহাম্মদ (সা.) চূড়ান্ত পর্যায়ে একথা বলে গেছেন। এই বাস্তবতা আজ চৌমাথায় দাঁড়িয়ে বলার উপযোগী। মানুষ পেটের চারপাশে চক্কর দিচ্ছে। প্রকৃত জীবন শেষ নিঃশ্বাস ফেলছে। মানবতার পুঁজি লুণ্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। আমরা একটি ডাক দিতে এসেছি, সত্যের ডাক, হকের ডাক। সাম্প্রতিক দুনিয়া এ ডাকের সাথে অপরিচিত। কিন্তু আমরা পৃথিবী থেকে নিরাশ নই। মানুষের কাছে এখনও হৃদয় আছে। সে হৃদয় মৃত নয়। তার ওপর ধুলোবালির আস্তর পড়েছে। ধুলোবালি ঝেড়ে আবর্জনা পরিষ্কার করে নিলে এখনো অবকাশ আছে, এখনো সম্ভাবনা আছে যে তা হক গ্রহণ করে নেবে এবং তার ভেতর ঈমানী অনুভূতি জাগ্রত হয়ে উঠবে।

কর্মীদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য

[নিম্নোক্ত ভাষণটি মাওলানা সাহেব আমেরিকার মুসলিম ছাত্র সংগঠন (এম. এস. এ.)-এর ৩ দিনব্যাপী পঞ্চদশ বার্ষিক কনভেনশন-এর উদ্বোধনী দিনে দিয়েছেন। 'ইসলামী পুনর্জাগরণ কার্যক্রম ও পারস্পরিক হৃদ্যতা' শীর্ষক বিষয়ে তিনি এ বক্তব্য রাখেন। উক্ত কনফারেন্সে বিভিন্ন দেশের ইসলামী স্কলার, বিজ্ঞ শিক্ষাবিদ, ইতিহাসবেত্তা ও বিদগ্ধ অর্থনীতিবিদরা উপস্থিত ছিলেন। জনাব মমতাজ আহমদ ভাষণটির ইংরেজী তরজমা পেশ করেন।]

শৈল্পিক মেহনত কার্যকর নয়

নতুন করে ইসলামী জাগরণে মুসলমানদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও হৃদ্যতা বিষয়ে আজ আমাকে কিছু বলতে বলা হয়েছে। বেঁধে দেয়া বিষয়ের ওপর আলোচনা করতে প্রয়াসী হব; তবে একথা ঠিক, আমি একজন বাস্তববাদী মুসলিম। ইসলামের ইতিহাসের ওপর সামান্য শিক্ষা অধমের আছে। আজকের আলোচনায় তাই স্থান পাবে উক্ত বিষয় আর আমার ক্ষুদ্র ইতিহাসগত অভিজ্ঞতা।

সুধীমণ্ডলি! আমি বিশ্বাস করি দাওয়াত কর্মীদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ক ও হৃদ্যতা ভিন্ন কোন কারণে হয় না। আমার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জ্ঞানে এমন কোন উপাদান খুঁজে পাচ্ছি না, যা আটার খামিরের মত মানুষের হৃদয়পটে অংকিত করে দেয়া যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য, শিল্পগত মেহনত মানবের পারস্পরিক হৃদ্যতা বজায় রাখতে যুৎসই হাতিয়ার নয়। ভালবাসা-সম্প্রীতির গতিধারার সূতিকাগার হচ্ছে আত্মা, যা উপলব্ধি করতে হয়। দলিল-দস্তাবেজ দিয়ে বোঝানো অসম্ভব। জগতে এমন কোন মাধ্যম খুঁজে পাওয়া যাবে না, যদ্দারা ভাঙ্গা হৃদয়, যার মাঝে কোন আকর্ষণ নেই, তাতে একটা অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারে। এমনিভাবে যাদের মাঝে কোন বাস্তবতা নেই, নেই অনুভূতির আধিক্য, এদের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করার মত কোন মাধ্যম খুঁজে পাওয়া গেছে বলে আমার জানা নেই। কাগজের এক পৃষ্ঠাকে অপর পৃষ্ঠা দ্বারা ঢেকে দেয়া যায় কিন্তু মানবের আত্মগত ব্যাপারটি ভিন্ন রকমের, স্বতন্ত্র ধাঁচের। এটি একটি অত্যন্ত নাযুক ব্যাপার, সুকঠিন প্রয়াস। কুরআন শরীফে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

لَوْاَنْفَقْتَ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّاۤاَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ -

"তুমি দুনিয়ার যাবতীয় মালমাত্তা ব্যয় করলেও তাদের প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না।" [সূরা আনফাল ঃ ৬৩]

তোমাদের কাছে যত ধনভাণ্ডার আছে, মাধ্যম আছে, তার সবটুকু ব্যয় করলেও তাদের মনে প্রীতির সঞ্চার করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা ঐক্যের সূত্রে তাদেরকে গ্রথিত না করলে, মনে প্রীতির সঞ্চার না করলে, জাগতিক কোন শক্তি তাদের মনে সৌহার্দ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে পারত না।

ভ্রাতৃত্বের অপূর্ব মিলন

আপনারা জানেন, মক্কা মুকাররম থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় যখন হিজরত শুরু হয়, তখন মুহাজির আনসারদের মাঝে মানবতা বা মনুষ্যত্ববোধ আর আরবী ভাষা ছাড়া আর কোন সম্পর্ক ছিল না। দীর্ঘ আলোচনার দিকে না গিয়ে শুধু এতটুকু বলতে চাই, আনসারদের বংশ আর মুহাজিরদের বংশীয় সম্পর্ক ছিল হেজাযের আদনান গোত্রের সাথে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের মাঝে একটা ঐক্যের সূচনা হয়েছিল। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖۤ اِخْوَانًا -

"আর তোমরা সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে দান করেছেন। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের মনে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে এখন তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের কারণে পরস্পর ভাই ভাই হয়েছ।" [আল ইমরান ঃ ১০৩]

সেই ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্কের বিকাশ তখন ঘটেছে, যখন মুহাজিররা মদীনায় পৌঁছেছে। আনসাররা শুধু নিজেদের ঘরেই তাদের জায়গা দেননি, বরং মনেই জায়গা করে দিয়েছিলেন। বসিয়েছিলেন চোখের ওপর। আনসারী মুহাজিরদের লক্ষ্য করে বলতেন, এটা আমার ঘর, এখন থেকে অর্ধেক আমার আর অর্ধেক আপনার। যে অংশ আপনার পছন্দ হয় বেছে নিন। এভাবে তারা শস্যক্ষেত্র, ভূমিসম্পদ ও অন্যান্য সম্পত্তিতে অর্ধেক অংশীদারিত্ব দেয়ায় প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন, এমন কি অনেক আনসারী এ কথা পর্যন্ত বলেছিলেন, আমার দু' স্ত্রী আছে। আমি একজনকে তালাক দিই, আপনি তাকে শাদী করে নিন। মুহাজিররা তাদের উত্তরে কি বলেছিলেন? তাঁরা আত্মসম্ভ্রমবোধের পরিচয় দিয়ে আনসারদের বলছিলেন, আমাদেরকে তোমাদের বাজারের পথ দেখিয়ে দাও, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

এই সম্প্রীতি শিল্পগত কোন মেহনতের বদলে হয়নি। মানব জীবন গঠনে একটা প্রশ্ন সর্বযুগে থেকে গিয়েছে যে, কর্মীদের নিয়ম-নীতি-আচার কেমনটি হবে? যেমনটি দুধ ও চিনির মিশ্রণ ঘটলে হয়। চিনি-দুধের মাঝে আমিত্ব

এমনভাবে বিলুপ্ত করে দেয়, যাতে দ্বিতীয়বার খুঁজে বের করা যাবে না। এভাবেই কর্মীদেরকেও একে অপরের মাঝে সংমিশ্রিত থাকতে হবে, যাতে একাকিত্ব ঘুচে যায়। আরেকটু বলতে গেলে, আমিত্ব যেন বিলুপ্ত হয়ে যায়!

কয়েকটি উদাহরণ

উপরিউক্ত ব্যাপারে এখন দু'একটি উদাহরণ পেশ করছি। অতঃপর মূল আলোচনায় ফিরে যাব। প্রথম উদাহরণটি সীরাতুন্নবী (সা.) থেকে দিচ্ছি। এর চেয়ে অতি উত্তম উদাহরণ আর হতে পারে না।

বদরের যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের কিছু লোক গ্রেফতার হয়েছিল। তন্মধ্যে আবু আজীজ বিন উমায়ের নামী এক ব্যক্তি ছিল। তার আপন ভাই মুছআব ইবনে উমায়ের (রা.) বদরের একজন ঝাণ্ডাবাহী সৈনিক ছিলেন। তিনি প্রথমেই মদীনায় এসেছিলেন। আবু আজীজ বিন উমায়ের-এর মশ্‌ক যখন বাঁধা হচ্ছিল, তখন মুছআব (রা.) গ্রেফতারকারীকে লক্ষ্য করে বলেন, খুবই শক্ত করে বাঁধ। এর দ্বারা অনেক টাকা-পয়সা উসূল হবে।

আবু আজীজঃ ভাই সাহেব! আমি মনে করছিলাম, আমার ব্যাপারে আপনি কোন ভাল কথা বলবেন, আমার জন্য সুপারিশ করবেন, এ আমার আপন ভাই! একটু খেয়াল করে তাকে বাঁধন দিও। ঢিলেঢালা করে বাঁধ। হায়রে আমার মায়ের উদরের সন্তান, পাপের কলিজার টুকরা! আপনি উল্টা সিধা বলা শুরু করছেন, বলছেন আরো শক্ত করে বাঁধতে, যাতে ফিদায়া অতিরিক্ত উসূল করা যায়।

হযরত মুছআব (রা.) এমন একটি উত্তর দিয়েছিলেন, যা স্বজনপ্রীতিহীন ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তিনি বলছিলেন, তুমি আমার ভাই নও। আমার ভাই তো সে, যে তোমায় শক্ত করে বাঁধবে।

একত্ববাদী বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা

একত্ববাদী আকীদা আর নিঃস্বার্থ ভালবাসা এমন বিপ্লবের সৃষ্টি করছিল মুছআব (রা.)-এর মনে যে, তিনি আপন ভাইয়ের দরদ ও স্বার্থ ভুলে গিয়ে বলছিলেন ঃ এখন তুমি আমার ভাই নও। আমার ভাই ঐ ব্যক্তি যে তোমার বাহু শক্ত করে বাঁধবে। তিনি এক নতুন আত্মীয়তার জন্ম দিলেন। সেটা রক্তের সম্পর্কের চেয়েও এক বিশাল মুবারক, উপকারী ও নন্দিত সম্পর্ক।

দ্বিতীয় একটি উদাহরণ পেশ করছি, একটি মশহুর ঘটনা। ইয়ারমুক রণাঙ্গনের এক সাহাবী আবু জুহাইম বিন হুজাইফা (রা.) বর্ণনা করেন ঃ আমি চাচাত ভাইয়ের তালাশে ময়দানে ঘোরাফেরা করছিলাম। যুদ্ধে যারা জখমী হয়,

তাদের খুব পিপাসা লাগে। আমি মশক ভরে পানি নিয়েছিলাম। কি জানি! যদি সে আহত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় পানি চায়, তখন যাতে পানি পান করাতে পারি। অকস্মাৎ আমি ভাইয়ের কাছে গেলাম, দেখলাম তার জান-কান্দানী শুরু হয়েছে, ঠোঁটে মৃত্যুফেনা গিজগিজ করছে। চেহারা সাদা হয়ে গেছে। আমি পানি পেয়ালা তার মুখে ধরতেই পাশের কেউ ক্ষীণ কণ্ঠে পানি বলে কাকুতি করে ওঠে। আমার ঐ ভাই বললেনঃ তুমি পানি নিয়ে ওকে দাও, ওই পানির হকদার। ওর পানির প্রয়োজন আমার চেয়ে বেশী। দ্বিতীয় জনের কাছে এসে তার মুখে পানি ধরতেই পূর্ববৎ তৃতীয় আরেক জনের পানি বলা চিৎকার কর্ণগোচর হলো। সে বলল, ওর কাছে পানি নিয়ে যাও। ঐ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী বর্ণনা দিচ্ছেন, ইসলামের ইতিহাসে আত্মত্যাগের এক কালজয়ী স্বাক্ষর হচ্ছে এই উপাদান। আমি এভাবে পর্যায়ক্রমে যার কাছেই পানি নিয়ে যাই, সে পাশের চিৎকার করে পানি আকুতিকারীর কাছে নিয়ে যেতে বলেন। এভাবে আমি আমার ঐ চাচাত ভাইয়ের কাছে ফিরে এসে দেখি তিনি শাহাদাতের শিরীন শরাব পান করেছেন। দ্বিতীয় জনের কাছে গিয়ে দেখলাম তাঁর অবস্থাও পূর্বাপর সাথীদের ন্যায়। আমার পানির পেয়ালা ভর্তিই রয়ে গেল। আল্লাহ্‌র বান্দার কারো ভাগ্যে পানি হলো না!

এ ঘটনা কল্পনাপ্রসূত নয়। বাস্তবিকই এমনটিই ঘটেছিল।

তৃতীয় ঘটনা

এ ঘটনাটি পূর্বাপর দু'টি ঘটনার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটি জীবন্ত ঘটনা। দুনিয়ার ইতিহাস সাক্ষী, সে এখনও নীরব ভাষায় বলে চলছে এসব যশোগাথা উপাখ্যান। সেই ইয়ারমুকেরই একটি ঘটনা। হযরত ওমর (রা.) মুসলিম সেনাবাহিনী প্রধান খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)-কে তাঁর পদ হতে অব্যাহতি দেয়াকে ভাল মনে করে আবু উবায়দা (রা.)-কে সেনাপতির পদে নিয়োগ করেন। হযরত ওমর (রা.) এই প্রথম ইতিজা কায়েম করলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সকল সৈন্যের নযর সেনাপতির দিকে, তাঁকে বিজয়ের মূল শক্তি মনে করা হয়। সম্ভবত এ দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম সৈন্যদর থেকে বিলীন করে দেয়ার জন্য তিনি খালেদ (রা.)-কে অব্যাহতি দিলেন, যাতে সৈনিকরা মনে করতে পারে, যেখানে খালেদ সেখানেই বিজয়, বিজয় আর খালেদ দু'টি পরস্পর বস্তুতে পরিণত, এমনটি নয়। এক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা ছেড়ে বান্দার ওপর ভরসা এসে যায় এবং তাই তাঁকে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিতে গিয়ে তিনি ফরমান জারী করলেন ঃ খালেদের পাগড়ি মাথা থেকে খুলে গলায় ধারণ করানো হোক (একা পদ থেকে অব্যাহতির লক্ষণ) সৈনিকরা যেন জানতে পারে, খালেদ (রা.) এখন সেনাপতি নেই। হযরত খালেদকে এ পয়গাম শোনানো হলে তিনি বললেন, ... (মেনে নিলাম, আত্মসমর্পণ করলাম)। খলীফার হুকুম আমার নয়নমণি

সমতুল্য। আমার যুদ্ধকৌশল ও যুদ্ধকর্মের কোন প্রকার পরিবর্তন হবে না। আমি যদি শুধু আল্লাহ্র উদ্দেশে লড়াই করে থাকি, তবে এখনও লড়ব। আর যদি ওমর (রা.)-এর জন্য লড়াই করে থাকলে তা' ছাড়তে হবে। কেননা ওমর (রা.) আমার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন। বঞ্চিত করেছেন আমাকে একটি মহান পদমর্যাদা থেকে। ইতিহাস কালের সাক্ষী, হযরত খালিদ (রা.) তরবারি নিয়ে আগের চেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে লড়াই করতে থাকেন। মহান পদ হারানোর পর একজন সাধারণ সৈন্যের কাতারে এসে প্রাণপণ যুদ্ধ করার দৃষ্টান্ত খালিদ বুঝি প্রথম পেশ করলেন! অধুনা গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থার দিকে তাকালে দেখতে পাই একজন সামান্য অফিসারকে পদচ্যুত করলে আন্দোলন শুরু হয় আর অফিসারটি কাজ হতে ইস্তফানামা দিয়ে বিদায় নেয়।

নিঃস্বার্থ ভালবাসা

একত্ববাদ মানুষকে নিঃস্বার্থ ভালবাসা শেখায়। নিখাদ ভালবাসা, মায়া-মমতা মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করলে মানুষকে করে তোলে এক অনন্য গুণের অধিকারী। নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও সম্প্রীতি যে জাতির মধ্যে প্রতিফলিত, ঐ জাতির উন্নয়ন অগ্রগতি কে ঠেকায়? তারা এমনও উপমা পেশ করেন, যা ইতিহাসে বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

হিজরী ১৩শ শতাব্দীর দাওয়াতের অনুপম দু'টি দৃষ্টান্ত

আমি আপনাদের সম্মুখে খোলাফায়ে রাশেদীন ও হুজুর (সা.)-এর জীবদ্দশার চারটি ঘটনা পেশ করছি যদ্দারা প্রতীয়মান হয়েছে, একত্ববাদে বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থ নিখাদ প্রীতি দ্বীনদার একজন মুসলমানদের জীবনে কিভাবে পরিবর্তন আনে এবং আত্মোৎসর্গের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, একতার প্লাটফরমে কি করে একটি জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এটাই ছিল ইসলামের চিরন্তন আলো, যার কিরণ ইনসায়িনতে গ্রথিত করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

......لٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِىْ قُلُوْبِكُمْ
وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ -

"কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহাব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং তা হৃদয়গ্রাহী করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।" [সূরা হুজুরাত ঃ ৭]

কিন্তু সেই সোনালী যুগের পর যেখানে নবুওয়াতির ছোঁয়া ছিল না, সে যুগেও আত্মত্যাগের এই অমর স্বাক্ষর কেউ রেখেছেন কি? এ অন্ধ বিশ্বাস আর কুপ্রবৃত্তি লালনের যুগ। বিংশ শতাব্দীর চরম যুগ সন্ধিক্ষণে এমন দু'চারজন কি খুঁজে পাওয়া যাবে? করা যাবে কি তাদের পদাংক অনুসরণ? আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই, ঈমান-আক্বীদাকে মযবুত করে ধরতে পারলে নিঃস্বার্থ ভালবাসা-প্রীতি পরিপক্ব হলে এমনও মরুব্বী ও সংস্কারক এ যুগে মিলবে, যাঁরা ইসলামের ইতিহাসের ঘটিত সেই লোমহর্ষক আত্মত্যাগের পুনরাবৃত্তি করতে পারেন। আমি এক্ষণে আপনাদের সম্মুখে মোজাহেদে আযম সাইয়েদ আহমদ শহীদ (শাহাদত ঃ ২৪শে জিলহজ্জ ১২৪৬ হিঃ ৬ই মে ১৮৩১)-এর আত্মত্যাগী কাফেলার সহযাত্রীদের জিহাদের শুধু দু'টি ঘটনা তুলে ধরছি। বেশী দিনের কথা নয়, এই তো সেদিন যখন ইংরেজ বেনিয়ারা সবেমাত্র ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং অনৈসলামী সংস্কৃতি ও জড়বাদের অশুভ ছায়া ইসলামী সংস্কৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করছিল।

সাইয়েদ আহমদ শহীদের সেনানিবাসের খাদ্যমন্ত্রী ছিলেন জনাব মৌলভী আব্দুল ওয়াহাব লক্ষ্ণৌবী। তিনি প্রত্যহ কুরআন তেলওয়াত করতে করতে সৈন্যদের মাঝে আটা বিতরণ করতেন, অনেক সময় ২০/২৫ লোকের আটা একজনের কাছে বিতরণ করতেন, অথচ গণনা করতেন না। কিন্তু আটার ভাণ্ডারে কখনও ঘাটতি দেখা দিত না।

একদিন তিনি আটা বিতরণ করছিলেন, এমন সময় মীর ইমাম আলী আজীমাবাদী নামে এক নতুন সেপাহী এসে আটার ভাগ চাইলেন। তিনি অত্যন্ত মোটাকায় ও শক্তিশালী ছিলেন। আটার বিতরণের নিয়ম ছিল–যে আগে আসবে আগে পাবে, পরে আসলে পরে। মৌলভী সাহেব তাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ তোমার পালা এলে পাবে, অতএব, তাড়াহুড়া করো না। এরপর সে তাড়াহুড়া করতে লাগল, শেষ পর্যন্ত মৌলভীকে ধাক্কা দিল। মৌলভী মাটিতে শুয়ে পড়লেন। এদিকে কান্দাহারী নামে এক ব্যক্তি আটা নিচ্ছিল। তার কাছে ব্যাপারটি অসৌজন্যমূলক মনে হওয়ায় মীর ইমাম আলীকে মারতে সংকল্প করল। মৌলভী সাহেব কান্দাহারীকে বললেন, না। তোমরা ওকে মেরো না। ও তো আমাদের ভাই, ধাক্কা দিয়েছে আমাকে, এতে তোমাদের মাথা ঘামানোর কি দরকার আছে? সকলে লজ্জিত হয়ে চুপ করল। মৌলভী সাহেব তাকে আটা দিলেন এবং সে চলে গেল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা সাইয়েদ সাহেবের কাছে গিয়ে ঘটনা খুলে বলল। রাত্রে মৌলভী সাহেব সাইয়েদ সাহেবের কাছে গেলে তিনি বললেন, মীর ইমাম আলী তোমার সাথে আজ কি করেছে? তিনি বললেন, তিনি এসে আমার কাছে আটা

চাইলেন। পাস যদিও তার ছিল না তবুও ব্যস্ততাবশে জলদি নিতে চাইলে আমার সাথে ধাক্কা লাগে। ব্যস! এতটুকু ঘটনা। সাইয়েদ সাহেব শুনে চুপ রইলেন। কেউ গিয়ে মীর ইমাম আলীর ঘটনা আদ্যোপান্ত খুলে বলল। মীর সাহেব কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে ঠিক ঐ সময়ই সাইয়েদ সাহেবের সামনে মৌলভীর কাছে মাফ চাইলেন এবং মুছাফাহা করলেন।

এর চেয়েও একটি লোমহর্ষক ঘটনা ঘটেছিল। সাইয়েদ আহমদ শহীদ (র.)-এর এক লোহোরী খাদেম যিনি তাঁর কিসাসে এনায়েতুল্লাহকে মাফ করে দিয়েছিলেন। কিসাস মাফ করে তিনি এক নতুন ইতিহাস কায়েম করলেন। আমি এ ঘটনা "সীরাতে সাইয়েদ আহমদ শহীদ" পুস্তকে বর্ণনা করেছি ঃ একদা এক খাদেম লাহোরী নামে ব্যক্তি যিনি অতিশয় সাদামাটা গোছের লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র। তাঁর ও শায়খ এনায়েতুল্লাহর ঘোড়ার ঘাস কাটার যৌথ দায়িত্ব ছিল। শায়খ এনায়েতুল্লাহ কোন কারণে তার ওপর নারাজ হন। স্মর্তব্য যে, শায়খ ছিলেন সাইয়েদ সাহেবের একজন প্রিয়জন ও কাছের লোক। রাগের আতিশয্যে তিনি লোহোরীকে এমন এক ঘুসি মারলেন, যাতে টাল সামলাতে না পেরে তিনি মাটিতে শুয়ে পড়ে কাতরাতে থাকেন। সাইয়েদ জানতে পেরে শায়খকে তিরস্কার করলেন। অতঃপর বললেন, তুমি কি মনে করছ আমি সাইয়েদ সাহেবের নিকটতম ব্যক্তি, থাকি তার পালঙ্কের কাছে। তোমার কি জানা নেই আমরা এখানে আল্লাহকে রাজী-খুশি করানোর জন্য এসেছি? তুমি কিভাবে এই নিকৃষ্ট কাজটি করলে? তুমি কি মনে কর লাহোরী শহরের একজন নিচু শ্রেণীর সহিস? এ বুঝেই তার গায়ে হাত দিয়েছ? জেনে রাখো! লাহোরী আর তুমি ও অপরাপর সকল মুজাহিদ আমার দৃষ্টিতে সমান। কারো ওপর কারো প্রাধান্য নেই।

এরপর তিনি হাফেজ ছাবের থানুভী ও শরফুদ্দীন বাঙ্গালীকে লক্ষ্য করে বললেন, এ দু'জনকে কাজী হেব্বানের কাছে নিয়ে যাও। এনায়েতুল্লাহর পদমর্যাদা আছে বলে সে যেন এক পেশে বিচার না করে। শরীয়া চুলচেরা বিশ্লেষণে যেন বিচার করেন।

পরের দিন যথাসময়ে হাফেজ ছাবের শরফুদ্দীন লাহোরী ও এনায়েতুল্লাহকে নিয়ে কাজীর দরবারে হাজির হন। তিনি এনায়েতকে সামনে বসালেন এবং যার পর নাই তিরস্কার করলেন। বললেন, তুমি অত্যন্ত জঘন্য কাজ করেছ। এরপর লাহোরীকে ডেকে বললেন, তুমি অমায়িক প্রকৃতির লোক, তোমরা ঘরদোর ছেড়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার মানসে বের হয়েছ। দুনিয়ার যিন্দেগী তো স্বপ্নের মত এক সময় বিলীন হয়ে যাবে। তবে একথা হচ্ছে, এনায়েতুল্লাহ তোমার ভাই। কু-প্রবৃত্তির বশে সে তোমায় মেরে বসেছে। এখন তুমি তাকে মাফ করে দিলে খুব

ভাল কথা। তুমি আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবে। আর বদলা নিলে কিছু পাবে না। মোট কথা, মাফ করার মধ্যে সওয়াব নিহিত। মাফ করে দেয়া আল্লাহর রাসূলের নীতি। আবার প্রতিশোধ নেয়া তাঁর নীতি। তবে মাফ করা উত্তম।

একথা শুনে লাহোরী বললেন, আমি যদি তাকে মাফ করে দেই, তাহলে সওয়াব পাব তো? মাফ করে দিলে কোন গোনাহ নেই তো? তিনি বললেন, না! গোনাহ নেই। দু'টোই আল্লাহর রাসূলের বিধান, যেটা মন চায় করতে পার। লাহোরী বললেন, আমি আমার হক্ব চাই। কাজী সাহেব বললেন, তোমার হক্ব হলো তুমিও এনায়েতুল্লার ঐ জায়গায় মারবে, যেখানে সে তোমায় মেরেছে। অতঃপর এনায়েতুল্লাহকে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। মারো! তোমার প্রাপ্য আদায় করে নাও!

আমার কি প্রাপ্য এই যে, আমি তাকে প্রচণ্ড ঘুসি দেব, যেমনটি যে আমায় দিয়েছে? কাজী সাহেব বললেন, জি হ্যাঁ।

উপস্থিত জনতা ধারণা করে নিয়েছিলেন, লাহোরী এই বুঝি এনায়েতুল্লাহকে ঘুসি লাগায়! লাহোরী সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা সকলে সাক্ষী! কাজী সাহেব আমায় অধিকার দিয়েছেন, আমি তার বদলা নিতে পারি। কিন্তু আমি নিছক আল্লাহকে রাজী খুশী করার জন্য তাকে মাফ করে দিলাম। এরপর এনায়েতুল্লাকে বুকে টেনে নিয়ে মুসাফাহা করেন। উপস্থিত জনতা হতবাক হয়ে যায়! সকলেই লাহোরীকে বাহ্‌বা দিতে থাকে। বলে, তুমি ক্ষমার অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কায়েম করলে!

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জীবন গঠন

রাসূলের মহাব্বত ছাড়া এ ক্ষমা সম্ভবপর নয়। নিছক আল্লাহ্ ও রাসূলের বাণী মুতালা করা ছাড়া এ ধরনের উদারতা, ক্ষমা ও সৌহার্দ্য প্রদর্শন সম্ভব নয়। এখানে যে ভাষণ দেয়া হলো এবং প্রবন্ধ পাঠ করা হলো, আমি তা স্বীকার করছি, অবশ্য প্রতিদান নিলে মনে করতে হবে রাসূলের মহাব্বত পয়দা হয়নি। মুহাব্বত পয়দা করার জন্য সীরাতে রাসূলের গবেষণা করতে হবে। ঐ গবেষণা রূহের খাদ্য হয়ে যাবে। পথের দিশা হবে। আমাদের কাছে কুরআন ও সীরাতের মত অতি উত্তম পাথেয় আর কিছু নেই।

আপনারা আমার যে সম্মান ও ইজ্জত করলেন, এর প্রতিদানস্বরূপ আমি আমার অভিজ্ঞতার নির্যাস আপনাদের সম্মুখে পেশ করব। আজ ইসলাম আমাদের এক পরম সম্পদ, ইসলামের কথায় কুরআন ও সীরাত পরিপূর্ণ, আত্মসঞ্জীবনী ও বিপ্লবাত্মক এই দ্বীন ও তার অলৌকিক ক্ষমতা সত্যিই এক অন্য শক্তি আমরা যা নিয়ে গৌরববোধ করতে পারি। আমাদের কাছে শক্তির যে প্রস্রবণ রয়েছে, তা

আমাদের আত্মাকে কাবু করতে পারে, আমিত্বকে বিলুপ্ত করতে পারে, দূর হয় কু-প্রবৃত্তি এবং যদ্দারা দিল ও অন্তর পরিষ্কার হয়, জমিনের অন্ধকার গলি দিয়ে আমরা আলোকোজ্জ্বল রাজপথে পৌছতে পারি, তাগুতের বিরুদ্ধে সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় রুখে দাঁড়াতে পারি, সেই শক্তির উৎস হচ্ছে আল্লাহর কিতাব তথা আল-কুরআন। কুরআন মজীদ আজও আপন শক্তিতে উজ্জ্বল, উপচে পড়ছে তার স ীবনী পানি। আমি উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে লক্ষ্য করে আরজ করতে চাই, সর্বপ্রথম যে জিনিষের সাথে আমাদের মহাব্বত রাখতে হবে, সীরাতে নব্বী। আজও তা নয়া বিপ্লবের জোয়ার বইয়ে দিতে পারে। সীরাতুন্নবী পর্যালোচনা করুন আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হবে, এক অধ্যায়। সমাজ জীবনের আমরা যেখানেই সীরাতকে বিদায় দিয়েছি, সেখান থেকেই আমাদের পতন শুরু হয়েছে। তাই সীরাতকে আঁকড়ে ধরতে হবে আমাদের হৃত ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে।

কু-প্রবৃত্তি একটি ব্যাধি

তারীখে ইসলামের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় হচ্ছে কু-প্রবৃত্তির পূজা। শত্রুর শত্রুতা আমাদের কখনো পরাজিত করতে পারেনি। আমাদের পরাজয় ত্বরান্বিত হয়েছে একমাত্র আত্মকলহের কারণে, অহেতুক মতপার্থক্যের কারণে আমাদের সেই আজিমুশ্বান সালতানাত হাতাছাড়া হয়ে গেছে, ফকীর হয়েছি আমরা ঐ একই কারণে। এক্ষণে আমি একটি উদাহরণ পেশ করছি। স্পেন থেকে মুসলিম জাতির নাম-নিশানা মুছে গেছে একমাত্র গৃহযুদ্ধ ও আত্মকলহের কারণে। এ কথা আমি কস্মিনকালেও বিশ্বাস করি না শুধু খ্রীস্টবাদী ক্রুসেডাররা আমাদেরকে স্পেন থেকে বিতাড়িত করেছে। মুসলিম শক্তির প্রদীপটির তেল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তখন। এর মূলে দায়ী ছিল উত্তর আরবীয়, হেজাযীয়, ইয়ামানী আরবদের গৃহযুদ্ধ ও অহেতুক আত্মকলহ ও মতপার্থক্য। ইকবালের ভাষায় স্পেনের বড় বড় মসজিদে দেখা গেছে অনেক দিন, কিন্তু চিরদিনের তরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আজান দেয়ার কণ্ঠ। মুসলিম বিতাড়িত প্রতিটি রাষ্ট্রেরই উপাখ্যান একই ধরনের, বিশেষ করে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী মোগল সম্রাটের পতনের মূলে দায়ী ঐ আত্মকলহ।

ইসলামী চেতনাকে জীবনের লক্ষ্য বানাও

আত্মার রোগ শুধু নসিহত কিংবা প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে উপশম করা যাবে না। কোন বস্তুকে পরাজিত করতে হলে অপর বস্তুটি শক্তিশালী হতে হয়। যেমন আগুন নেভাতে হলে পানি ঢালতে হয়। কোন জিনিষকে গরম করতে হলে আগুনের দরকার হয়। আত্মার চেয়ে নসিহত ও প্রবন্ধ শক্তিশালী নয়, তাই তা দ্বারা আত্মার রোগ নিবারণ সম্ভব নয়। ঐ রোগ শরীরে থাকাকালীন আমাদের পারস্পরিক

মহাব্বত ও সুসম্পর্ক বজায় থাকবে না। সর্ববিধ চেতনার ওপর ইসলামকে প্রাধান্য না দিলে পরিস্থিতি বদলাবে না, বরং পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে।

জড়বাদ নয়-রাসূলের (সা.) আদর্শই মুক্তির পথ

আমি ইউরোপের বিভিন্ন সফরে প্রায়শই বলে আসছি, আজ আপনাদের সামনে এক বিরাট পরীক্ষা! রাসূলুল্লাহ (সা.) আপনাদের আঁচল ধরে থাকবেন, তিনি আল্লাহর কাছে কিয়ামত দিবসে এই মামলা করবেন, আমি তোমাদেরকে এক বিশাল ময়দানে রেখে এসেছিলাম, তোমরা এখানেই ইসলামের আলো ছড়াতে পারতে, দিগ্বিজয়ীদেরকে বিজিত করতে পারতে, কিন্তু তোমরা আত্মকলহ, গৃহযুদ্ধ ক্ষমতা দখলের রেষারেষিতে লিপ্ত ছিলে। বল! তোমরা সেদিন কি জবাব দেবে?

ইসলামের সাথেই এ দেশের ভাগ্য জড়িত

[১৬ই মার্চ ১৯৮৪ শুক্রবার ঢাকা জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে প্রদত্ত খোৎবা]

হামদ ও সালাতের পর।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا ـ واذكروا
نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم
فاصبحتم بنعمته اخوانا ـ وكنتم على شفا حفرة من
النار فانقذكم منها ط كذلك يبين الله لكم ايته لعلكم
تهتدون ـ

"তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর রজ্জু আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে আর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চারিত করেছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরেছ। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছিলে, আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদের জন্য নিদর্শন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যাতে তোমরা সরল পথ পেতে পার।"
[আল-ইমরান ঃ ১০৩]

প্রিয় ভাই সকল! আল্লাহ্ পাকের হাজার শোকর, তিনি এক জায়গায় একত্রে এতো অধিক সংখ্যক মুসলমানের মুখ দর্শনের সৌভাগ্য দান করেছেন।

এমন এক সময় ছিল যখন একজন মুসলমানের সাক্ষাৎ লাভের জন্য চোখ তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকত। দুনিয়াতে মুসলমানের সংখ্যা এতো অল্প ছিল যে, হাতের আঙ্গুলে তা গণা যেত। আর আজ আল্লাহ্‌র রহমতে পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহর সংখ্যা শত কোটিও ছাড়িয়ে গেছে। এই মোবারক মুহূর্তে দুনিয়ার কত লক্ষ মসজিদে আল্লাহ্‌র মুমিন বান্দাগণ আল্লাহ্‌র সামনে সিজদাবনত হতে উপস্থিত হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

আমাদের প্রত্যেকের এ অনুভূতি থাকা উচিত, আল্লাহ্ আমাদেরকে কত বড় নিয়ামত দান করেছেন! বস্তুত কালেমার সৌভাগ্য, ঈমান ও তাওহীদের সৌভাগ্যই দুনিয়ার সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য। পৃথিবীর যাবতীয় ধন-দৌলত হাসি মুখে লুটিয়ে

দেয়া যেতে পারে এ সৌভাগ্য লাভের মোকাবেলায়। ঈমান ও তাওহীদের মূল্য এমনই যে, কোন মুসলমানকে যদি বলা হয়, তোমাকে দশ দুনিয়ার সম্পদ দেয়া হবে যদি তুমি কালেমার বিশ্বাস প্রত্যাহার করে নাও, তবে সেই মুহূর্তে তার মুখ থেকে বুক ফাটা চিৎকার বেরিয়ে আসবে, হে দ্বীন দুনিয়ার মালিক, কি অপরাধ করেছি, শয়তানের লোলুপ দৃষ্টি আমার ঈমানের ওপর পড়ল?

তুরস্কের অভিশাপ কামাল আতাতুর্কের সময় আরবীতে আযান দেয়ার ব্যাপারে সরকারী বিধি-নিষেধ জারী হয়েছিল। বাধ্যতামূলকভাবে তুর্কী ভাষায় আযান দিতে হতো, তুর্কী মুসলমানগণ আরবী ভাষায় আযান শোনার জন্য ছটফট করছিল। তুর্কীরা আমাকে জানিয়েছে সরকারী বিধি-নিষেধ প্রত্যাহারের পর প্রথম যখন আরবী ভাষায় আযান দেয়া হলো, মসজিদের মিনারে যখন ধ্বনিত হলো الله اكبر- আরবী আযানের সেই সুমধুর সুর মূর্ছনায় গোটা তুর্কী জাতি এমনই আত্মহারা হয়ে পড়েছিল যে, রাস্তায় নেমে এসে তারা উল্লাসে নৃত্য শুরু করে দিয়েছিল। হাজার হাজার দুম্বা এই খুশীতে জবাই করে ফেলেছিল। মৃত্যুর পূর্বে মদীনার ভাষায় মদীনার আযান শোনার সৌভাগ্য হলো। এখন আমরা নবীজীর সামনে গিয়ে উজ্জ্বল মুখ নিয়ে দাঁড়াতে পারব। রাস্তায় রাস্তায় জনতার ঢল দেখে যে কোন পর্যটকের এ ধারণা হতে পারত, বুঝি বা তুর্কীরা সদ্য স্বাধীনতা লাভ করেছে! কনস্টান্টিনোপলের বৃহত্তম মসজিদে জামে সুলায়মানীতে আমি সালাত আদায় করেছি, অন্যান্য মসজিদেও আমি গিয়েছি। সালাম ফিরিয়েই তুর্কীরা আরবী ভাষায় যে কথাটি বলে তা

وعلى نعمة الاسلام الحمد لله ـ

" আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের নিয়ামত দান করেছেন ; এখন তার প্রশংসা ও শোকর।" আমি বলছি না, আপনারাও তুর্কীদের অনুকরণ শুরু করুন। আলেমগণ কিছুতেই এতে অনুমোদন করবেন না আমাদের। তাই বলা উচিত যা আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাদের শিখিয়েছেন। কিন্তু ইসলামের প্রতি তুর্কীদের এই স্বীকৃতজ্ঞ অনুভূতিকেও আমি শ্রদ্ধা না করে পারি না।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! ইসলামের প্রতি কৃতজ্ঞচিত্ত হও। ইসলামকে নিয়ে গর্ব করতে শেখো। যতদিন তোমরা ইসলামকে দুনিয়ার সকল সম্পদের ওপর প্রাধান্য দেবে, ইসলামের মোকাবিলায় সর্বস্ব বিসর্জন দিতে শিখবে, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের ও তোমাদের দেশের ওপর আসমানের কল্যাণ ধারা বর্ষণ অব্যাহত থাকবে।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

واذ كروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمه اخوانا - وكنتم على شفاحفرة من النار فانقذ كم منها -

"তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করোঃ যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেছেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হতে পেরেছ। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছিলে, তখন তিনি তোমাদের তা থেকে রক্ষা করেছেন।"

আল্লাহর অনুগ্রহ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করো। তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে। একে অন্যের খুনপিয়াসী ছিলে। فالف بين قلوبكم আল্লাহ্ তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেছেন। হৃদয়ে ভালোবাসার ফুল ফুটিয়েছেন। فاصبحتم بنعمته اخوانا ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। বল, কোথায় এভাবে বড়-ছোট, আমীর-গরীব, রাষ্ট্রপ্রধান ও সাধারণ নাগরিক এক সাথে এক কাতারে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শামিল হতে পারে! আল্লাহ্র ঘরে আসার পর মাহমুদ-আয়াযের সকল ব্যবধানই মুছে যায়। এখানে সাদা কালো সবাই ভাই ভাই। পৃথিবীতে মানুষে মানুষে যত বিরোধ লড়াই ছিল ইতিহাসের পাতায় আজ তার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ নেই। ভাষা ও বর্ণের দ্বন্দ্ব, গোত্র ও সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব, ধনী দরিদ্রের শ্রেণীদ্বন্দ্ব, ভূস্বামী ও ভূমিহীনদের দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে গোটা-পৃথিবী ছিল দ্বন্দ্বমুখর। মানুষের হাত লাল হতো মানুষেরই খুনে। মানুষের আহাজারি ও আর্তনাদ চাপা পড়ে যেত মানুষের নারকীয় উল্লাস ও অট্টহাসিতে– فاصبحتم بنعمته اخوانا -

অতঃপর তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হলে। আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذ كم منها -

জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে তোমরা উপনীত হয়েছিলে। আল্লাহ তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। যদি আল্লাহর দ্বীন অবতীর্ণ না হতো, যদি নবী-রাসূলগণ দুনিয়াতে প্রেরিত না হতেন, যদি আল্লাহ্র শেষ নবীর শুভাগমন না হতো, তবে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে আর কিছুই তো অবশিষ্ট ছিল না। দেখুন, পৃথিবীর কত বড় বড় দার্শনিক, চিন্তাবিদ, পণ্ডিত ও রাষ্ট্রনায়করা আজ ঈমান ও তাওহীদের মতো সহজবোধ্য ও সাধারণ জ্ঞান (উমববমভ ওনভ্রণ)-টুকু থেকে বঞ্চিত, অথচ আমার আপনার মতো সাধারণ লোককে আল্লাহ্ ঈমানের দৌলত দান করেছেন। কোন

দর্শন, কোন আন্দোলন ও কোন শ্লোগানই যেন এ জাতির সামনে ইসলামের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে না দাঁড়াতে পারে। বোখারী শরীফের হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "কেউ যদি তিনটি বিষয়ের অধিকারী হতে পারে তবে বুঝতে হবে, তার ঈমান পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রথমত আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলই তার কাছে পৃথিবীর অন্য সব কিছুর চেয়ে বেশী প্রিয় হবে। দ্বিতীয়ত কুফরী জীবনে প্রত্যাবর্তন করা তার কাছে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়েও অধিক কষ্টদায়ক মনে হবে। এটা প্রকৃতপক্ষে নবী-রাসূলদেরই উত্তরাধিকার। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

ام كنتم شهداء اذحضر يعقوب الموت ط اذقال لبنيه ماتعبدون من بعدى ط قالوانعبد الهك واله ابائك ابراهيم وإسمعيل واسحق الهاواحدا ط ونحن له مسلمين -

"ইয়াকুবের মৃত্যুর সময় তোমরা কি সেখানে উপস্থিত ছিলে, যখন সে তার সন্তানদের জিজ্ঞাসা করছিল, "আমার পরে তোমরা কার ইবাদত করবে?" তখন তারা উত্তরে বলল ঃ আপনার, ইব্রাহীমের, ইসমাঈলের ও ইসহাকের ইলাহের ইবাদত করবো যিনি এক অদ্বিতীয়।" [বাকারা ঃ ১৩৩]

মৃত্যুর সময় ইয়াকুব তাঁর সন্তানদের ডেকে বৈষয়িক কোন কথা বলেন নি। বলেন নি, অমুক স্থানে আমার অত সম্পদ গচ্ছিত আছে, অমুকের কাছে এত পাওনা আছে, তোমরা তা সংগ্রহ করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিও। এটা বলা অস্বাভাবিক কিংবা অন্যায় হতো না। তা না করে সন্তানদের ডেকে তিনি বললেনঃ হে প্রাণাধিক পুত্রগণ! আমাকে একটা কথাই শুধু বলো– وماتعبدون من بعدى ؟ আমার এ চোখ দু'টো বন্ধ হওয়ার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তোমাদের ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে না পারলে কবরেও আমার শান্তি হবে না। তারা উত্তরে বলল ঃ আব্বাজান! আপনি এতটা পেরেশান কেন? ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক; ইয়াবুব আলাইহিমুস সালামের পবিত্র রক্ত আমাদের শিরায়ও প্রবাহিত, আমরা মরে যাওয়া পছন্দ করব কিন্তু মুহূর্তের জন্য শিরকের পাপ স্পর্শ সহ্য করব না نعبدالهك واله ابائك আমৃত্যু আমরা আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষের মাবুদ আল্লাহ্র অনুগত থাকব।

সন্তানদের এ উত্তরে শুনে তবে তিনি আশ্বস্ত হলেন। এ-ই হওয়া উচিত

প্রত্যেক মুসলমানের বৈশিষ্ট্য। নিজের ও পরিজনদের ঈমানের হিফাজতের জন্য তাকে থাকতে হবে সদাসতর্ক, সদাসন্ত্রস্ত। সন্তান ও পরিজনদের শিক্ষা-দীক্ষা এমনভাবে দিতে হবে যেন তার মৃত্যুর পরও তারা ঈমান ও তাওহীদের প্রতি অবিচল থাকতে পারে, সীরাতুল মুস্তাকীম থেকে চুল পরিমাণ বিচ্যুত না হয়। প্রত্যেক মুসলমানকেই নিজের ও পরিজনদের ঈমানের ব্যাপারে নিশ্চয়তা (ঐলটরটর্ভণ) লাভ করা অপরিহার্য। ঈমানের সাথে সাথে শির্‌ক ও কুফরীর সাথে সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের প্রতিও প্রচণ্ড ঘৃণা ছাড়া ঈমান সর্বদা অরক্ষিত। এজন্য কুফরীর প্রতি ঘৃণা পোষণের কথা ঈমানের আগে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

فم يكفر بالطاغوت ويؤ من بالله -

"যারা তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান আনবে।"

ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করুন। কত বড় দেশ আপনাদেরকে আল্লাহ্‌ দান করেছেন! এদেশ সম্পর্কে কুদরতের ফয়সালা এই, ইসলামের মাধ্যমেই এদেশ সম্মান ও গৌরব লাভ করবে। কল্যাণ ও নিরাপত্তা লাভ করবে। মসজিদে নববীর মিম্বরের প্রতিনিধিত্বকারী আপনাদের এ মসজিদের মিম্বরে বসে বলছি, এদেশের সুখ-শান্তি, মর্যাদা ও নিরাপত্তা ইসলামের সাথেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আল্লাহ্‌ না করুন, যদি এ দেশ কখনো আল্লাহ্‌প্রদত্ত নিয়ামতের ব্যাপারে কৃতঘ্ন প্রমাণিত হয়, ইসলামের সাথে তার সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে কিংবা এ দেশের মানুষ আল্লাহর রজ্জুকে ছেড়ে অন্য কোন রজ্জু আঁকড়ে ধরতে চায় তবে এ দেশের ধ্বংস অনিবার্য। কোন পরিকল্পনা, প্রকল্প ও বাইরের কোন সাহায্য ও ছত্রছায়াই এ দেশকে আল্লাহ্‌র প্রতিশোধ থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

يايها الذين امنوا ادخلوا فى السلم كافة -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো।" [বাকারা ঃ ২০৮]

মাথাকে মসজিদে গলিয়ে দিয়ে গোটা দেহ বাইরে রেখে দিলে একথা বলা যাবে না, আপনি মসজিদে প্রবেশ করেছেন। তদ্রূপ আল্লাহ্‌ পাকেরও দাবী হলো, তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ করো। আকীদা ও বিশ্বাস, ইসলামী আহাকাম ও বিধি-বিধান, ইসলামী আইন, সমাজ ব্যবস্থা ও ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুন, এক কথায় গোটা 'আল ইসলামের' কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করতে হবে। একমাত্র তখনই শুধু আল্লাহর দরবারে আপনার ইসলাম গ্রহণ স্বীকৃতি ও অনুমোদন

লাভ করবে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কাছে যখন আল্লাহর নির্দেশ এল, اسلم"হে ইব্‌রাহীম, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করো", তখন সাথে সাথেই তিনি বলে উঠলেন ঃ اسلمت لله رب العالمين "রাব্বুল আ'লামীন আল্লাহরও দরবারে আমি পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করলাম।" আপনাকে, আমাকেও ইব্‌রাহীমের মিল্লাতভুক্ত হওয়ার সূত্রে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হবে।

ভাই ও বন্ধুগণ! আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে একবার আশ্রয় গ্রহণ করে দেখুন, আকাশ থেকে নিয়ামত ও প্রাচুর্যের অফুরন্ত ধারা কিভাবে নেমে আসে!

ولوان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم
بركلت من السماء والارض -

"বস্তিবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং আল্লাহ নির্দেশ মেনে নিত তাহলে আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় বরকত ও প্রাচুর্যের দুয়ার তাদের জন্য খুলে দিতাম।" [আরাফ ঃ ৯৬]

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, ইসলামের সাথে এ দেশের ও রাসূলে আরাবী (সা.)-এর সাথে এ জাতির সম্পর্ক চিরঅটুট থাকুক! রিযিক, নিয়ামত, বরকত ও প্রাচুর্যের অফুরন্ত ধারা এ জাতির ওপর বর্ষিত হোক! সুখ-শান্তি ও স্থিতিশীলতা এখানে বিরাজ করুক! ভাইয়ে ভাইয়ে ভালোবাসা, সম্প্রীতি, আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ বিরাজ করুক!

প্রবাসী মুসলমানদের প্রতি আবেদন, উপদেশ ও পরামর্শ

[নিম্নের বক্তৃতাটি ২০ শে জুন, ১৯৭৭ আমেরিকার শিকাগো শহরে মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারে প্রদত্ত হয়। সমাবেশে আমেরিকার বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন ও সংস্থার সদস্যবৃন্দ বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এটি ছিল মাওলানার আমেরিকা সফরকালীন প্রদত্ত সর্বশেষ বক্তৃতা। এমন আশা ছিল না যে, তিনি এত বিপুল সংখ্যক ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত দায়িত্বশীল সাথীদের সাথে আর কথা বলার সুযোগ পাবেন। এজন্য তিনি তাঁর সুবিস্তৃত অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার সারনির্যাস, সদিচ্ছাপূর্ণ পরামর্শ ও সশ্রদ্ধ আবেদন বক্ষ্যমাণ বক্তৃতায় তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন।]

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আজ তিন সপ্তাহ হলো আমি উত্তর আমেরিকা ও কানাডা সফর করছি। এ সময়ে উর্দূ ও আরবীতে আমি ডজনখানেক বক্তৃতা দিয়েছি। বক্তৃতা তো বক্তৃতার মতই হয়। এর ভেতর বাগ্মিতা থাকে, থাকে বিভিন্ন বিষয় ও এর পুনরাবৃত্তি। কিন্তু আজকের এ মজলিসের ও আজকের বক্তৃতার প্রকৃতি ইতোপূর্বে প্রদত্ত বক্তৃতাগুলো থেকে একটু ভিন্ন হবে। আজ আমি বক্তৃতা দেব না। আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলব। কথাও আবার এমন যেমন একই পরিবারের একজন সদস্য অপর সদস্যের সঙ্গে বলে থাকে। অনেক দিন পর আপনজনের সঙ্গে, প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হবার পর কেউ যেমন নিজের প্রতিক্রিয়া ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেয়, ঠিক তেমনি এই অধিবেশনে কিছু কাজের কথা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পর্যায়ক্রমে আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আমার অনুরোধ, আপনারা এগুলো আপনাদের ডায়েরীতে লিখে নিন কিংবা নোটবুকে টুকে নিন, গেঁথে নিন স্মৃতির পাতায়। আমার এই আলোচনায় যেমন অতিশয়োক্তির আশ্রয় নেব না, তেমনি বিনয়ের আতিশয্যও এতে থাকবে না, থাকবে না কোন প্রকার টীকাভাষ্য।

এ সফরে বিভিন্ন জায়গায় নানা ব্যক্তি ও সংস্থা-সংগঠনের সদস্যদের সাথে মিলিত হবার পর আমার মস্তিষ্কে কয়েকটি কথা গেঁথে গেছে এবং এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, এই সফর যা ..ও.ই. এবং আমার প্রিয় ও একনিষ্ঠ ভ্রাতৃবৃন্দের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও চেষ্টা সাধনার ফলে সম্ভব হয়েছে, যারা গত তিন-চার বছর থেকে আমাকে স্মরণ করছিলেন, কথাগুলো এই সফরের পুঁজি ও মূল্যবান উপহার হিসেবে বিবেচিত হবে। আমি আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করছি এবং আপনারাও দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমার মুখ দিয়ে এমন সব কথা বের করেন যা অনেক দিন পর্যন্ত আপনাদের কাজে আসবে এবং আমার সফরও সার্থক হবে। কেননা আমি খুব ভয় পাচ্ছি, আমি এই সফরের হক আদায় করতে পারলাম কিনা। এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমি এলাম; তাছাড়া

সফরের ব্যাপারে যেসব জরুরী ইন্তেজাম ও আবশ্যকীয় বিষয়াদি সম্পন্ন করতে হয় সেসব পেরিয়েই আমাকে আসতে হয়েছে এবং আপনাদেরকেও এজন্য অনেক দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছে, সব কিছুর পর এক্ষণে তার পুরো ফলটা (র্ণ গ্রলর্ফ) কি? ভয় হয়, না জানি আল্লাহর দরবারে এজন্য আমি প্রশ্নের সম্মুখীন হই! হতে পারে এই সফর দ্বারা অনেক ভুল-ভ্রান্তি হয়েছে, অনেক গাফলতি হয়েছে। আমি সেই মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারিনি যেই মাপকাঠির ওপর আমার টিকে থাকা দরকার ছিল। হতে পারে আজকের কথাবার্তার ভেতর দিয়ে সে স্তরের কিছুটা কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ্ করুন কথাগুলো যেন আপনাদের মনেও থাকে! কেননা কথা তো অনেকই হয় আর প্রতিটি বক্তৃতার পর প্রশ্নোত্তর পর্বও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কিন্তু কাজের কথাগুলো ভুলিয়ে দেয়া হয়। এও হয় বক্তার বক্তৃতাকালেই শ্রোতাদের মনে প্রশ্ন খুঁজতে লেগে যায় এর ওপর আমরা কি প্রশ্ন করব। আমার অনুরোধ, যতক্ষণ আমি আপনাদের সাথে কথা বলব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আপনাদের মস্তিষ্ককে প্রশ্ন তৈরির কাজে ছেড়ে দেবেন না।

সবচে' বড় ক্ষতি ঃ প্রথম কথা হলো এই, আপনারা এর জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করুন আপনাদের কাছে ইসলামের যে পুঁজি রয়েছে তা যেন খোয়া না যায়। আপনাদের কল্পনায় চেতনায় যদি কিছুটাও এই চিন্তা ঠাঁই পায়, দুনিয়ার যিন্দেগী কত সংক্ষিপ্ত আর আগামী দিনের যিন্দেগী কত দীর্ঘ এবং আখেরাতে কোন্ কোন্ স্তর অতিক্রম করতে হবে তাহলে আপনার শরীরের লোম খাড়া হয়ে যাবে, বরং এমনও হতে পারে তীব্র পেরেশানীর দরুন আপনার প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে। আমরা যদি এই দেশে সব কিছুই করি, কিন্তু আখেরাতের চিন্তা ও আল্লাহর ভয় হারিয়ে বসি তাহলে আমাদের মত দুর্ভাগা আর হবে না কেউ। একজন বাস্তববাদী মানুষ হিসেবে আমি বলছি, আল্লাহর কসম! নিজেদেরকে এ ধরনের বিপদের মাঝে নিক্ষেপ করার চেয়ে এও ভাল আমরা পথের ফকীর হিসেবে কড়ির কাঙাল হয়ে জীবন যাপন করি। আমাদের প্রিয় সন্তানদের ধর্মীয় ভবিষ্যতকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবার চেয়ে দীন দরিদ্রের জীবন যাপনও ভাল। সব কিছু পেলাম, বিনিময়ে ঈমানী সম্পদ হারালাম, এর চেয়ে বড় ক্ষতি আর কিছু নেই।

হুযুর (সা.) বলেন, "যার ভেতর তিনটি জিনিস পাওয়া যাবে তার ঈমান পরিপূর্ণতা পাবে, পূর্ণাঙ্গ হবে। তার ভেতর একটা হলো এই, কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তনের কল্পনাও তাকে এতখানি আতংকিত করবে যেমন কাউকে আতংকিত করে তাকে (হাত-পা বেঁধে) আগুনে নিক্ষেপ করতে গেলে।"

আর আমরা যেন নিম্নোক্ত আয়াতের প্রয়োগস্থলে পরিণত না হই ঃ

قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا ـ الذين ضل سعيهم فى الحيوة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ـ

"বল, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে, তারা সৎ কাজ করছে।" [সূরা কাহাফ ঃ ১০৩-৪ আয়াত]

এর ভেতরে বিরাট শিক্ষণীয় বিষয় এটাই, বেচারারা মনে করে আমরা খুব ভাল করছি। আমার ভয় হয় এই আয়াত আমাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়ে বসে! বহু লোক আছে যারা ভুল করে, অন্যায় করে এবং মনে করে ভুল কাজ করছি। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার বৈশিষ্ট্যই এই, মানুষ মনেই করে না যে সে ভুল কাজ করছে, অন্যায় কাজ করছে। নিজের কাজে সে তৃপ্ত ও নিশ্চিন্ত এই ভেবে সে ভাল কাজ করছে। যেমন, ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আমি আমার কোন বন্ধুকে যদি জিজ্ঞেস করি, তোমার ভাই কোথায় এবং কি করছে? তাহলে সে বলবে, মাশাআল্লাহ্ সে আমেরিকায় মাসে এত হাজার ডলার বেতন পায়। এ ধরনের কথা সেখানে বলা হবে বা বলা হয়। আর এখানে আমরা কি বলি? আমরা বলি, আরে ভাই, আমরা তো এখানে খুব ভাল আছি। হায়দারাবাদ, ইউপি, বিহার, লাহোর, করাচী (ঢাকা, চিটাগাং, খুলনা)-তে থাকলে কি পেতাম আর কি খেতাম! আমরা এখানে যা পাচ্ছি তা ওখানকার মন্ত্রী-মিনিস্টাররাও পান না।

প্রথমত কথা যা বলতে চাই তা হলো, আপনারা এর থেকে সতর্ক হোন, ভয় করুন এবং সর্বপ্রকার উন্নতি ও প্রাচুর্যের মুকাবিলায় ঈমানের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিন যেন এখান থেকে, দুনিয়া থেকে নিরাপদে চলে যেতে পারি, এবং হাশরের ময়দানে ঈমানী হালতে উঠতে পারি। আমিতো বলি, যে ব্যক্তি আমেরিকায় থেকে নিরাপদে ঈমানটা সাথে নিয়ে যাবে এবং হাশরের ময়দানে ঈমানসহ উঠবে তার পুরস্কার ও সওয়াব তার থেকে অনেক বেশি হবে যে আরব ভূখণ্ডে থেকে ঈমানসহ উঠবে। কেননা আমেরিকায় বসবাসকারী লোকটি তার ঈমানের প্রোজ্জ্বল দীপশিখাটির হেফাযত করেছে অন্ধকার তুফানের ভেতর থেকে। হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে, হুযুর (সা.) বলেন, আমার কিছু ভাই এমন হবে যারা ঈমানের ওপর কায়েম থাকবে এবং দ্বীনের পাবন্দী করবে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বলেন, তোমরা তো আমার সঙ্গী-সাথী। আমার ভাইতো তারা যারা আমাকে দেখেনি। তারা বহু পরে আসবে। আমাকে না দেখে তারা বিশ্বাস করবে।

আমেরিকায় ওলীর দরজা

এটা আদৌ অতিশয়োক্তি নয়, আপনারা আমেরিকায় ওলীর বেলায়েতের উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদা হাসিল করতে পারেন। আল্লাহর নিকট আপনাদের আমল অনেক বেশী প্রিয় হবে। সন্তান যখন কোথাও দূরে চলে যায় তখন মার মন সন্তানের সাথে লেপ্টে থাকে। মা সন্তানের জন্য দোয়া করতে থাকে এই বলে, আমার সন্তান বিদেশ বিভূঁইয়ে পড়ে আছে। আল্লাহ্! তুমি আমার সন্তানের হেফাযত কর। আপনারা ইসলামের সেই সব সন্তান যারা ইসলামের কেন্দ্রভূমি থেকে বহু দূরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কুফুর ও বস্তুবাদের ফাঁদে পড়ে আছেন, আপনাদের ওপর আল্লাহর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে। আপনারা কখনওই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না।

ঈমানকে সর্বাবস্থায় অগ্রাধিকার দিন। দারিদ্র্য ও বুভুক্ষু অবস্থায় ঈমান লক্ষ গুণে উত্তম সেই সম্পদ ও সাম্রাজ্যের চেয়ে যা ঈমানবর্জিত। মাশাআল্লাহ্। আপনারা সকলেই ধীশক্তিসম্পন্ন ও শিক্ষিত। আপনারা যদি এতটুকু আশংকা বোধ করেন এখানে ঈমান বিপদের সম্মুখীন, তাহলে আপনাদেরকে সমস্ত পরিবার-পরিজন নিয়ে নিজ নিজ দেশে যেখানে আপন দ্বীন ও ঈমানের হেফাযতের নিশ্চয়তা আছে, যদি পায়ে হেঁটেও যেতে হয়, তবুও চলে যাবেন। মনে করবেন আল্লাহর সেই নির্দেশ ঃ

.... فلاتموتن الاوانتم مسلمون

"আর তোমরা মরো না, আল্লাহর অনুগত বান্দা না হয়ে"। [সূরা বাকারা ঃ ১৩২ আয়াত]

সর্বাবস্থায় প্রতিটি আমল করবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করুন। আমি আপনাদেরকে দু' মিনিট সময় দিচ্ছি যাতে কথাগুলো আপন হৃদয়মানসে গেঁথে নিতে পারেন।

আল্লাহর সন্তুষ্টি

দ্বিতীয় কথা হলো নিজেদের নিয়তকে সহীহ-শুদ্ধ করতে থাকুন। যে কাজই করুন আল্লাহর রেযামন্দী তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য করুন। এর ভেতরে কোন প্রকার প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ কিংবা পদমর্যাদা হাসিল অথবা অন্যবিধ উদ্দেশ্য টেনে আনবেন না। দুনিয়ার লাভ তো আপনি, আল্লাহ চাহেত আপনার যোগ্যতা ও পরিশ্রম মুতাবিক পাবেনই, কিন্তু নিয়ত সর্বদাই ঠিক রাখবেন যাতে আমলের সহীহ সওয়াব পেতে পারেন। হাদীসে পাকে বলা হয়েছে ঃ

"সর্বপ্রকার আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকে তার আমলের ভেতর থেকে এতটুকুই পাবে যতটুকুর নিয়ত সে করেছে। যদি কোন লোক হিজরত আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের জন্য করে থাকে তবে তার হিজরত আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের জন্যই হবে। আর কারুর হিজরত যদি দুনিয়া লাভ কিংবা কোন মহিলার পাণি গ্রহণের উদ্দেশে হয়ে থাকে তবে তার হিজরত সেজন্যই হবে যে উদ্দেশে সে হিজরত করেছে।" [বুখারী শরীফের প্রথম হাদীস]

এজন্যই মাঝে-মধ্যে নিজের নিয়ত সহীহ-শুদ্ধ করে নিন। সকল কাজে নিয়ত হবে আল্লাহর খুশী এবং ইসলাম ও মুসলমানের খেদমত। আল্লাহ্ চাহেত এতে আপনারা জিহাদেরও কখনও কখনও শাহাদতের সওয়াব পাবেন।

আমলের ওজন

আপনারা ঈমান ও ইহতিসাব (আল্লাহর ওয়াদার ওপর একীন এবং তার পুরস্কার ও সওয়াবের লোভে কাজ করা)-এর ওপর আমল করুন যাতে আমল ওজনদার হয়। আল্লাহর নিকট কেবল সেই সব আমলই ওজনদার হয়ে থাকে যা ঈমান ও ইহতিসাবের সঙ্গে সম্পন্ন হয়। রমযান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"যে ব্যক্তি রমযানের রোযা আল্লাহর ওয়াদার ওপর একীনপূর্বক এবং তার সওয়াব লাভের লোভে পালন করবে তার গত জীবনের সমস্ত গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।"

কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন ঃ ভাল! কেউ কি বদ নিয়তে রোযা রাখতে পারে? কিন্তু বন্ধুগণ! জেনে নিন, একটা হলো বদ নিয়তি আর আরেকটা হয় বে-নিয়তি। আমি প্রায় বলে থাকি মুসলমান বদ নিয়তের খুব কমই হয়ে থাকে, কিন্তু বেশীর ভাগ তারা বে-নিয়তের শিকার অর্থাৎ তারা কোন আমলের সময়-সুযোগ হলে আদপে তারা চিন্তাই করে না এই আমল তারা আল্লাহর রেযামন্দীর নিয়তে করছে নাকি অভ্যাসবশে কিংবা প্রথাগতভাবে করছে। যন্ত্রের মত মেশিনের মত আমল করলে তেমন কিছু লাভ দর্শে না।

দিলকে শাণিত করুন

তৃতীয় কথা হলো, নিজের ব্যাপারে গাফিল থাকবেন না, বরং আপন আমলের ও নফসের মুহাসাবা করুন, খতিয়ান নিতে থাকুন। নিজেই নিজের পরীক্ষক হোন এবং নিজের কর্মের ভালমন্দ সব খুঁজতে থাকুন। এজন্য আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দেব, বছর-দু'বছর পর আপনারা নিজ নিজ দেশে কিছুদিনের জন্য হলেও অবশ্যই যাবেন, দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন। ভারত ও পাকিস্তান, বাংলাদেশ, হারামায়ন শরীফ হলে তো আরও ভাল। সেখানে থেকে ভাল হক্কানী ও আল্লাহ্ওয়ালা আলেম-উলামা ও পীর বুযুর্গদের খেদমতে হাযির হোন, যেসব

আলেম-ওলামা ও পীর-বুযুর্গ স্বার্থলেশহীন, যাঁদের সান্নিধ্যে গেলে আল্লাহর কথা মনে পড়ে, তাঁদের সঙ্গে দেখা করুন, তাঁদের সাক্ষাতে মিলিত হোন অথবা কোন দ্বীনী পরিবেশে কিছু সময় অতিবাহিত করুন। যদি শুধু এখানেই থাকেন তাহলে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ও ঈমানী কায়ফিয়াতের যে পুঁজিটুকু আছে তা কেবল খরচই হতে থাকবে। যেমন কোন ব্যাটারী অব্যাহতভাবে ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যায় তার শক্তি, সেই অবস্থায় নতুন ব্যাটারী-সেলের প্রয়োজন দেখা দেয়, ঠিক তদ্রূপ আপন দিলের ব্যাটারীকেও নতুন নতুন ব্যাটারী সেল দিতে থাকুন এবং অল্পস্বল্প বিরতির পর দু'বছর-চার বছর পর হলেও নিজের দেশে যান। আমরা দেখেছি, যেসব লোক নিজ নিজ দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে বা রেখেছে তাদের ভেতর এমন কিছু পাওয়া যায় যা সেসব লোকের ভেতর পাওয়া যায় না, যারা দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি কিংবা একেবারেই ছিন্ন করেছে, তারা জানে না, যে দ্বীনের মাপকাঠি কি, কায়ফিয়াত কি? উদর পূর্তি ছাড়া জীবনের কোন পরম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাদের সামনে নেই। নামাযের জায়গায় নামায আর রোযার জায়গায় রোযা রাখা—কোনটার ঘাটতি কোনটা দিয়ে পূরণ হবার নয়। এসব এখানেও করে বটে, কিন্তু তাদের ধারণাই হয় না, এসবের ভেতর কতটা ফাঁক-ফোকর সৃষ্টি হয়ে গেছে, এসব কতখানি ভরাট হয়ে গেছে। আল্লাহর প্রিয় ও মকবুল বান্দাদের অবস্থা কি? তাদের সালাতের অবস্থা কেমন এবং ইবাদত বন্দেগীর অবস্থাই বা কেমন আর তাদের রুচির প্রকৃতিই বা কি?

দ্বীনী পরিবেশকে পাওয়ার-হাউজ মনে করুন। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে আল্লাহর ফযলে এখনও দ্বীনী পরিবেশ বর্তমান এবং সেখানে এমন সব লোক আছেন যাদের কাছে বসলে আসলেই অন্তরের কালিমা সাফ হয়ে যায়। একথা আমি বলছি বিরাট অভিজ্ঞতা থেকে, হেজাযেও আমার এ অভিজ্ঞতা হয়েছে যেখানে আমি বরাবর গিয়ে থাকি। সেখানে আমি দেখেছি যেসব খান্দান উপমহাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে আর এটাতো পরিষ্কার, হারামায়ন শারীফায়নই ইসলামের আসল মারকায-মূল কেন্দ্র। কিন্তু সেখানেও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব পৌঁছুচ্ছে। সম্পদের সেখানে ছড়াছড়ি। সেখানে গিয়ে এই ধারণা জন্মে, আমাদের আর কি? আমরা তো হারাম শরীফের অধিবাসী! কা'বা শরীফের চতুর্দেয়ালের ছায়ায় আছি। যারা উপমহাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, সেখানে আসা-যাওয়া করেন, উর্দু ভাষার সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন যে ভাষায় ধর্মীয় কিতাবাদি, পত্র-পত্রিকা ও দাওয়াতী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, হিন্দুস্থান, পাকিস্তান ইদানীং বাংলাদেশ থেকেও উলামায়ে হকের আগমন ঘটে তখন তারা আপনাদের এখানেই এসে ওঠেন, আপনারা তাদেরকে বিভিন্ন মাসলা-মাসায়েল ও নানা সমস্যা সম্পর্কে

জিজ্ঞাসাবাদ করে থাকেন। তাদের দ্বীনী ও ধর্মীয় হালত ভাল। তারা বেশির ভাগ সময় হারাম শরীফ গিয়ে থাকেন, তারা বেশি বেশি ওমরা করে থাকেন, মদীনায়ে তায়্যিবায় হাযিরা দেবার ও রওযায়ে আকদাস (সা.)-এ যিয়ারতের আগ্রহ এবং সেখানকার প্রতি আদব-সম্মান তাদের ভেতর বেশি দেখতে পাওয়া যাবে। রসূলুল্লাহ (সা.)-এর (তাঁর প্রতি আমার আব্বা-আম্মা কুরবান) পবিত্র ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে গভীর ও হার্দ্য সম্পর্কে তাদের ভেতর দেখতে পাওয়া যায়।

পূর্বসূরী বুযুর্গদের প্রতি সুধারণা পোষণ

চতুর্থ কথা হলো, আপনারা আমেরিকায় আছেন। আপনাদের পড়াশোনার প্রতি গভীর আগ্রহও আছে, আগ্রহ আছে জানার প্রতি। ইসলামী সাহিত্য আপনারা পড়ে থাকেন। আমি দেখেছি, এখানে ইংরেজী ও উর্দু সাহিত্যের বেশ ভাল ভাল বই-পুস্তক পঠিত হয় এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দের এখানে আগমন ঘটে। এখানে তাদের বক্তৃতা হয়। একটি কথা আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে বলছি, আপনারা আপনাদের পূর্বসূরীদের ও উম্মাহর সেই সব লোক সম্পর্কে, যারা স্ব স্ব গণ্ডিতে দ্বীনের জন্য, মিল্লাতের জন্য কাজ করে গেছেন, কু-ধারণা পোষণ করবেন না। এটা খুব বিপদের কথা, আশংকার কথা। এ ব্যাপারটা আমাদের সেসব ভাইয়ের ভেতর খুব বেশি দেখা দিচ্ছে, অধ্যয়নের ওপর যারা একান্তভাবেই নির্ভরশীল। সমালোচনামূলক বই-পুস্তক ও নিবন্ধ পড়তে গিয়ে তাদের মনে হয় কেউ ইসলামের ওপর পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ কোন কাজই করেনি। ঐ সব বই-পুস্তক ও নিবন্ধের প্রভাবে তারা দ্বীনী খেদমত পরিমাপ করবার জন্য একটা ফিতা বানিয়ে নেন যেই ফিতার সাহায্যে তারা প্রত্যেক সংস্কারক তথা মুজাদ্দিদকে মেপে থাকেন, যেমনটি সামরিক বিভাগে ভর্তির জন্য রিক্রুটদেরকে মাপা হয়। এটা ঠিক নয়।

আপনাদের জানা নেই ঐসব আল্লাহর বান্দা কী কঠিন অবস্থার ভেতর কাজ করেছেন! উদাহরণ হিসেবে বলছি, যদি কেউ বলেন, শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (র.) যিনি পীরানে পীর ও বড় পীর সাহেব নামে বিখ্যাত, ইসলামী হুকমাত কায়েম করতে পারেন নি, বসে বসে কেবল ওয়ায করতেন। আব্বাসী খলীফারা ইসলামী নিজাম তথা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে অকেজো ও নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিল, তারা অন্যায়ভাবে খেলাফত দখল করে রেখেছিল যখন খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়া কায়েম ছিল না, সে সময় শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (র.) এর জন্য কোন চেষ্টা করেন নি কেন?

ভদ্র মহোদয়গণ! আপনাদের জানা নেই আল্লাহর এই সিংহ কি কাজ করেছেন। আজ পর্যন্ত আফ্রিকা তাঁর কাছে ঋণী এজন্য, সেখানে ইসলাম তাঁর সূত্রে বিস্তার লাভ করেছে। ইন্দোনেশিয়া, ভারতবর্ষসহ আরও বহু দেশে তাঁর মাধ্যমে ইসলাম প্রবেশ করেছে এবং বিস্তার লাভ করেছে। কত মৃত ও শুষ্ক অন্তরকে তিনি সঞ্জীবিত করেছেন। আল্লাহ্ মালুম, কত লোককে তিনি কুফর ও শির্ক-এর অন্ধকার থেকে আলোয় এনেছেন। তাছাড়া তিনি মনে করতেন, এই সব আব্বাসী খলীফারা তো রসূলুল্লাহ (সা.)-রই খান্দানের লোক। এরা কুরআন শরীফ সেভাবেই বোঝে যেভাবে আমরা বুঝি। তারা বংশগতভাবে আরব হাশিমী খান্দানের। তাহলে ব্যাপারটা হলো এরা খিলাফতের হক আদায় করছে না। আসলে তাদের ওপর দুনিয়ার মুহব্বত, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা জেঁকে বসেছে। এরা নফসের গোলাম হয়ে গেছে। তাহলে বোঝা গেল সমস্ত রকম খারাবীর মূল নফসের গোলামী ও দুনিয়ার মুহব্বত আর তিনি এ রোগেরই চিকিৎসা করতেন, আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করি, আজ পাকিস্তানে খারাবীটা কি? এটা কি মুসলিম দেশ নয় এবং সেখানকার রাষ্ট্রপ্রধান কি মুসলমান নন? তারা ইসলামের নামে এদেশ বানিয়েছিল। এই তো কালই আমাকে পাকিস্তানের এক বন্ধু বললেন, আমার এক বন্ধুর ছেলে লায়ালপুরে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত এক মিছিলে শরীক ছিল। কেউ স্লোগান দেয়, পাকিস্তান কিসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? তখন সে বলে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ। ঠিক এমনি মুহূর্তে একটি গুলি এসে তার বুকে লাগে এবং সে মরণের মুখে চলে পড়ে (জুলফিকার আলী ভুট্টোর সময় সাধারণ নির্বাচনের পর এই ঘটনা ঘটেছিল)। এখন বলুন, তরুণটি কোন মুসলমানের হাতে গুলি খেয়েছিল নাকি কোন অমুসলিম অন্য কোন দেশ থেকে এসে তাকে গুলি করেছিল। এই যা কিছু হচ্ছে, কেন হচ্ছে? মুসলমান মুসলমানকে গুলি মারছে কেন? যদি আল্লাহর কোন বান্দা এই অন্যায়-অরাজকতার মূল কারণ হিসেবে দুনিয়াপ্রীতি ও নফ্স পূজাকেই মনে করে থাকেন তাহলে তিনি কি অন্যায়টা করলেন যে সারাটা জীবন আপনি তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকলেন?

ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে সকলেরই অংশ রয়েছে, যারাই কোন না কোনভাবে এর খেদমতে অংশ নিয়েছেন ঃ কোন কোন সময় যে কোন কারণেই হোক, এ ধরনের মানসিকতা সৃষ্টি হয়, ব্যস, একটাই কাজ। কেউ যদি ইসলামী হুকুমত কায়েমের সংগ্রামে না নামেন, এর জন্য চেষ্টা না করেন, তাহলে তিনি কোন কাজই করেন নি, তা তিনি হযরত শায়খ আবদুল কাদের জিলানীই হন অথবা হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী কিংবা হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীই (র.) হন। এ ধরনের ধারণা ও চিন্তা-চেতনা ইতিহাস সম্পর্কে ভাসা ভাসা অধ্যয়নেরই ফসল। আমি পরিষ্কার বলছি, ইসলাম যে আজও দুনিয়ার বুকে বহাল

তরবিয়তে টিকে আছে, তার নিরাপদ অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, এতে সকলেরই অংশ রয়েছে। মুহাদ্দিসীনে কিরাম, ফুকাহায়ে ইজমা উম্মাহর বুযুর্গবৃন্দ, ওলীয়াল্লাহ সকলেই এতে অংশীদার।

যদি কেউ বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র.) কি করেছেন, কি করতেন? নামায-রোযার মসলা বাতলিয়েছেন। তাঁর তো ইসলামী খিলাফত ও ইসলামী সালতানাত কায়েম করা দরকার ছিল। সালতানাত ভদ্রে! খিলাফত কায়েম হতো বটে, কিন্তু আপনাদের নামায পড়া কে শেখাতেন? আর সেই খিলাফত কোন্ কাজের যেই খিলাফতে কেউ নামাযের সহীহ তরীকা ও নিয়ম-নীতি জানে না?

আল্লাহ্ পাক বলেন, "সেই সব লোক যাদেরকে আমি দুনিয়ার বুকে কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎ কাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।" এ নয়, যাদেরকে আমরা নামায পড়তে শেখাব, তারা হুকুমত কায়েম করবে। তরতীব হলো, হুকুমত হবে এই উদ্দেশে যাতে করে সালাত কায়েমের পরিবেশ অনুকূল হয়, যাতে কেউ ওযর পেশের অবকাশ না পায়। আল্লাহ্ পাক বলেন, "যাতে ফেতনা না থাকে এবং দ্বীন সমগ্রটাই আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।" আপনাদের দিলে যেন এ ধারণা ঠাঁই না পায়! সকলেই অসম্পূর্ণ। ইসলাম কেউই বোঝেনি। কেউই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম কায়েম করার চেষ্টা করেনি। মনে রাখবেন সকলেই তার যথাসম্ভব, সাধ্যমত ও সামর্থ্য মুতাবিক দ্বীনের খেদমত ও তার হেফাযতে নিয়োজিত ছিলেন। কেউ ওয়ায করেছেন, কেউ বক্তৃতা দিয়েছেন, কেউবা হাদীস পড়িয়েছেন, কেউ ফতওয়া প্রদান করেছেন, কেউ কিতাবাদি লিখেছেন। সকলেই তার নিজ নিজ জায়গায় ও স্ব স্ব আসনে ইসলামের খেদমত ও মুসলমানদের তরবিয়তের কাজ করেছেন এবং প্রত্যেকেই যে যার পৃথক সীমান্ত আগলে রেখেছেন, সামলে রেখেছেন।

সূফীয়ায়ে কিরামের অবদান

যেসব লোক নিজেদের জায়গায় বসে আল্লাহর নাম শিখিয়েছেন এবং মানুষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছেন তাদের কাজকে অবজ্ঞা করবেন না। এ কাজ যারা করেছেন প্রচলিত ভাষায় তাদেরকে সূফিয়ায়ে কিরাম বলা হয়। আপনাদের জানা নেই সূফিয়ায়ে কিরাম কি খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তারা ইসলামী সমাজকে অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। আমার কাছে এর প্রমাণ আছে। তারা এমন বুনিয়াদী কাজ করেছেন তা যদি তারা না করতেন তাহলে বস্তুবাদের এই সয়লাব লোকদেরকে খড়-কুটোর মত ভাসিয়ে নিয়ে যেত এবং টোপা ফেনার মত মুসলিম উম্মাহ ভাসত। তাদেরই জন্য লোকের স্থিতি ঘটেছিল

এবং খেয়াল-খুশি ও নফস পূজার বাজার গরম হতে পারত না। আর কেউ যদি এর শিকার হয়েও যেত অমনি তার ভেতর এই অনুভূতিও সৃষ্টি হয়ে যেত, আমি ভুল করছি, অন্যায় কাজ করছি। এরপর সে তাদের কাছে যেত, কাঁদত, তওবা-ইস্তিগফার করত অর্থাৎ অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইত। অতঃপর এই সব সূফিয়ায়ে কিরাম তাদের কাজের মানুষ বানাতেন এবং আপন জায়গায় বসিয়ে দিতেন। আমাদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ। আমি তারীখে দাওয়াত ও আযীমত (অনুবাদক কর্তৃক মুহাম্মদ ব্রাদার্স থেকে "সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস" নামে অনূদিত হয়ে ইতিমধ্যেই এক খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বাকি খণ্ড প্রকাশের পথে) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছি, দোষ ইতিহাস লেখার, ইসলামের ইতিহাসের নয়। ইতিহাস যা লিখিত হয়েছে তা রাজা-রাজাদের দরবার আশ্রিত; সম্রাট ও রাজা-বাদশাহদের দরবারকে ঘিরেই তা আবর্তিত থেকেছে। ফলে এই ইতিহাসে সংস্কার আন্দোলনের পরিপূর্ণ পর্যালোচনা নেই। নইলে এতে কোন শূন্যতা নেই।

ইসলাম ও কুরআন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অন্ধকারের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল না

একথা কখনওই মনে করবেন না, ইসলামকে এখনই কিছু লোক বুঝেছে, এর আগে কেউই পুরো ইসলাম বোঝেই নি। ইসলামের ওপর এ এক বিরাট ইলযাম, অপবাদ। ইসলামের যোগ্যতা ও সামর্থ্যের ওপর বিরাট বড় কলংক। এ দ্বারা কুরআন শরীফের যিন্দেগী এবং এর সুস্পষ্ট ও উপলব্ধিযোগ্য অনুধাবনযোগ্য হওয়াটাই সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত হয়ে পড়ে থাকে। সুস্পষ্ট আরবী কিতাব, সুস্পষ্ট আরবী ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে। এছাড়া যেই কিতাবটি হাজার বারো শ' বছর পর্যন্ত বোঝা যায়নি, বোঝা গেল না, এখন কি নিশ্চয়তা আছে তা যথাযথ ও সহীহ শুদ্ধভাবে বোঝা গেছে? এজন্য আমি এমন সব লেখাকে ক্ষতিকর মনে করি যা মানুষকে এই ধারণা দেয়, হাজার বারো শ' বছর যাবৎ ইসলাম বোঝা যায়নি কিংবা কিছু কিছু ইসলামী হাকীকত বা গূঢ় সত্য এ পর্যন্ত বিলকুল অন্ধকারে আছে। এ কথা মানতে আমি আদৌ প্রস্তুত নই। ইসলামের বুনিয়াদী উসূল বা মূলনীতি, কুরআনের হাকীকত ও দ্বীনের সত্যতা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। কেউ যদি মনে করেন বহুকাল যাবৎ তা বোঝা যায় নি তাহলে এটা তার দৃষ্টিশক্তির ত্রুটি। একটি কথাও কেউ প্রমাণ করে দিক কুরআন করীমের এই হাকীকত মুসলিম বিশ্ব একেবারেই ভুলে গেছে, বিস্মৃত হয়েছে। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র.) তো এতদূর পর্যন্ত বলেছেন, একটি সুন্নতও এমন নেই যা গোটা আলমে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে উঠে গেছে। যদি পৃথিবীর এই কোণে তা না থাকে তাহলে অন্য কোণে তা পাওয়া যাবে।

আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

সূর্য যেমন বাস্তবে অস্তমিত হয় না, এক স্থানে অস্ত গেলে অন্য জায়গায় তার উদয় ঘটে, ঠিক ইসলামের হাকীকতসমূহও তদ্রূপ। যদি এক স্থানে তা পর্দাবৃত হয় তো অন্য স্থানে তা দীপ্তভাবে প্রকাশিত হয় এবং এজন্য জীবনের বাজি ধরে। একথা যেন কখনও মনে না আসে, হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে কেউ ইসলামকে পুরোপুরি বোঝেই নি। মনে হয় ইসলাম যেন কোন জটিল ও গুপ্ত বিষয় বা কোড বাক্য! ত্রিত্ববাদের মত এমন কোন বিষয় যা বোঝানোর জন্য বিজ্ঞ বড় দার্শনিক দরকার। না, এমন নয়। এও হতে পারে, আপনাদের সঙ্গে আমার আর পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটবে না। তাই আপনাদের খেদমতে আমি এই কথাগুলো পেশ করছি। কারুর ওপর হামলা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কেবল এজন্য কথাগুলো পেশ করছি যাতে গোটা বিষয়টা খোলাখুলি আপনাদের সামনে এসে যায়। একটা কথা, পূর্বসূরী বুযুর্গদের প্রতি সুধারণা রাখুন এবং তাদের জন্য দোয়া করতে থাকুন। কুরআন শরীফে আছে ঃ

والذين جاءو من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل فى قلوبنا
غلاللذين امنوا ربنا انك رءوف رحيم -

"আর (তাদের জন্যও) যারা ওদের (মুহাজির ও আনসারদের) পর এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও ঈমানী অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমিতো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু।"

[সূরা হাশর ঃ ১০ আয়াত]

আপনারা পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করুন। এর ভেতর ঈমানের বড় হেফাযত রয়েছে। নইলে মানুষের জবান বড় বেয়াড়া ও লাগামহীন হয়ে যায়; যা খুশি বলে ফেলে। ভাইসব! তারা কি দ্বীন বোঝেনি যারা আমাদের থেকে আমলে, ইলমে ও নৈকট্যে কত বড় ছিলেন? তারাই যখন দ্বীন বোঝেন নি তখন আমরা কি করে বিশ্বাস করি, আশ্বস্ত হই যে আমরা বুঝে ফেলেছি?

সালাতের ইহতিমাম

আরেকটা কথা এই, এদেশে ঈমানের হেফাযতের সূরত হলো আপনাদের হাত থেকে নামায যেন ছুটে না যেতে পারে। সময় মত নামায আদায় করতে চেষ্টা করুন। হযরত ওমর (রা.) সরকারী কর্মকর্তাদের উদ্দেশে প্রেরিত একটি সরকারী

পত্রে লিখেছিলেন ঃ তোমাদের সকল কাজে ও যাবতীয় ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো নামায। যে এ ব্যাপারে যত্নবান হলো এবং একে হেফাযত করল সে সব কিছুই হেফাযত করবে। আর যে এ ব্যাপারে উদাসীন রইল এবং একে নষ্ট করল সে কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। অতএব, নামায আদায়ে যত্নবান হোন, চাই কি আপনি বাজারেই থাকুন অথবা অন্য কোথাও, ফরযটা আদায় করবেনই। বাকি সুন্নতগুলো যতদূর সম্ভব আদায় করতে চেষ্টা করুন। এই সুন্নত ও নফলগুলো ফরযগুলোকে হেফাযত করে।

শেষ কথা হলো এখানকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির হাত থেকে, যা শীর্ষ বিন্দুতে গিয়ে উপনীত হয়েছে, নিজেদেরকে হেফাযত করুন। কিছু কিছু বিষয়ে আমি এখানে খুবই অলসতা ও উদাসীনতা লক্ষ্য করেছি। আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, এখানে নারী-পুরুষের একত্রে মেলামেলা খুবই বেড়ে গেছে। সাধ্যমত নারী-পুরুষের মিলিত সমাবেশ ও মজলিসগুলো থেকে বাঁচতে চেষ্টা করুন। এমন কোন মজলিস যেখানে মেয়েরাও অংশ নেবে এবং সেখানে আপনার অংশ গ্রহণও জরুরী সেক্ষেত্রে তাদের অধিবেশন পৃথক রাখুন, এমন কি তাদের গমনাগমনের পথও ভিন্ন রাখুন। এর ভেতর আপনার হেফাযত রয়েছে। মুসলিম সমাজ বিরাট হেকমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হাদীসে পাকে নারী-পুরুষের একত্রে মেলামেশা ও নির্জনে অবস্থান সম্পর্কে খুবই কঠিন বাক্য উচ্চারিত হয়েছে, ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আমেরিকার সভ্যতার এই সব আসর আপনারা গ্রহণ করবেন না। যতটা পারেন ইসলামী সভ্যতা, সংস্কৃতি, ইসলামী সমাজের হেফাযত করুন এবং এর উত্তম বৈশিষ্ট্যগুলো, এর ভাল দিকগুলো টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করুন।

পরিশেষে আমি আপনাদের খেদমতে আরয করব, আল্লাহ্ করুন, আমার আলোচনা থেকে আপনারা যেন ভুল না বোঝেন এবং এও যেন মনে করবেন না আমি কোন আক্রমণাত্মক ও নেতিবাচক (নেগেটিভ) কথা বলেছি। আমি যা কিছু বলেছি আপনাদের প্রতি সহানুভূতিবশত বলেছি এবং নিজের দায়িত্ব মনে করে বলেছি। আমার দিলে সকলের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে এবং ঔদার্যের ক্ষেত্রে আমার কিছুটা বদনামও রয়েছে। আল্লাহর ফযলে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক রয়েছে এবং আমি সকলকেই সম্মান করি। কিন্তু তারপরও আমি আমার নৈতিক দায়িত্ব মনে করে আপনাদের সামনে কয়েকটি কথা বলেছি। ইনশাআল্লাহ্ শক্তি-সামর্থ্য মুতাবিক আমি আপনাদের জন্য দোয়া করতে থাকব আর আপনাদের কাছেও আমার একইরূপ প্রত্যাশা।

উলামায়ে কেরাম : মর্যাদা ও দায়িত্ব

[১৯৮২ সালে হায়দারাবাদে প্রদত্ত একটি ভাষণ। সেখানকার প্রখ্যাত আইনজীবী জামীলুদ্দীন সাহেবের বাসস্থানে আয়োজিত এক মাহফিলে বিপুল সংখ্যক উলামায়ে-কেরাম ও মাদ্রাসা পরিচালকদের উদ্দেশে প্রদত্ত এই ভাষণে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে উলামায়ে কিরামের মর্যাদা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি।]

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

يايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط -

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর জন্যে ন্যায় সাক্ষ্য দাও।' [সূরা মাইদাঃ ৮]

সম্মানিত উলামায়ে কেরামের এই মহতী মাহফিলে কোন কথা আরম্ভ করা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। বিজ্ঞজনদের একটি কথা আছে, 'যেমন পাত্র তেমন কথা।' সে হিসেবে আমিও চেষ্ট করব আজকের এই মওকা মাফিক-অবস্থার চাহিদা অনুযায়ী কিছু কথা উপস্থাপন করতে।

অনেকে তো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা থেকেও অনেক বড় বড় ফলাফল বের করেন। দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকি ঘটনা মন্থন করে আবিষ্কার করেন অনেক বড় বড় শিক্ষা। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিখ্যাত কবি শেখ সাদী (র.)-এর কোন জুড়ি নেই। অবশ্য উপমা স্থাপন ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে মাওলানা রুমীকেও অদ্বিতীয় বলতে হবে। তাঁরা ছোট ছোট ঘটনা থেকে গভীরতম শিক্ষা সন্দেশ তুলে আনতেন। আমিও আমার অনুভব, অনুভূতি ও স্বীয় শিক্ষা থেকে একটি কথা বলতে চাই! আপনারা জানেন, আমি দিল্লী থেকে হায়দরাবাদে এসেছি। আমি যে গাড়িতে করে এসেছি সে গাড়ি কত দিক মুখ করে চলেছে, চলার পথে কত এলাকা পার করে এসেছে তাতো কেবল আল্লাহ মালুম। কিন্তু 'কম্পাস' রীতিমতই আমাকে কিবলা বলে দিয়েছে। গাড়ির দিক পরিবর্তন, আবহাওয়ার বিবর্তন কোন অবস্থারই সে তোয়াক্কা করেনি। গাড়ির গতি বদল, দিকের পরিবর্তন আর পরিবেশের বৈচিত্র্য সর্বাবস্থায়ই সে আমাকে যথা কিবলা নির্দেশ করে গেছে। এসবের পরিবর্তন বিবর্তন দ্বারা সে মোটেই প্রভাবিত হয়নি।

আমি যখন ভাবলাম, বিষয়টি আমাকে খুব আলোড়িত করল। আমার খানিকটা লোভও হলো, একটি মানবনির্মিত জড় পদার্থ এতটা বিশস্ত নির্দেশক অথচ আমরা!

আমার মনে হলো, একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র অথচ অবস্থার শত উত্থান-পতনেও সে তার দায়িত্ব পালনে অবিচল। সে তার নীতি ও আদর্শে এতটা অনড় যে, গাড়ি কোন্ দিকে যাচ্ছে সেদিকে তার মোটেও লক্ষ্য নেই। এমনি মানুষ (সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জাতি) সেও এদিক মুখ ফেরাচ্ছে। কিন্তু 'কম্পাস' তার অবস্থানে অবিচল। সদা স্থির স্বীয় দায়িত্ব পালনে। সে এক মুহূর্তের জন্যে পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে না। একটি বারের জন্যেও ভুল দিক নির্দেশনা দিচ্ছে না। আর তার নির্দেশনা মত আমরা নামায পড়ছি। একটি কম্পাসের এই স্থিরতা ও বিশ্বস্ততা আমার মর্যাদাবোধে দারুণভাবে আঘাত করেছে। আমাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। সাথে সাথে আমার ভেতরে এই শিক্ষাও জেগেছে, আচ্ছা, একটি কম্পাস! সেও তার পারিপার্শ্বিকতার পরোয়া করে না। সেও তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলে যায় না। সর্বদাই নিরলসভাবে কিবলা নির্দেশ করে যাচ্ছে। স্বীয় বাহককে দিক বাতলে যাচ্ছে। স্বীয় দায়িত্বে এক বিন্দু আগ-পর নেই; অবহেলা নেই। আর তখনই আমার মনে হলো, উলামায়ে কেরামকেও কম্পাসের মত হওয়া উচিত, তাদের হওয়া উচিত কম্পাসের মত অটল অবিচল দৃঢ়। অবস্থা যা-ই হোক, যুগের হাওয়া যে দিকেই চলুক, আলেমকে থাকতে হবে স্বীয় অবস্থানে অনড়-পাহাড়সম স্থির। যুগ ও সময় বাগে না আসলে, বাতাস কেবল উল্টো বইলে নিজেকে যুগের মত করে সাজাবার, নিজেকে বাতাসের সরল স্রোতে ভাসিয়ে দেয়ার কোন অবকাশ নেই বরং যুগ ও সময়কে বাগে আনতে চেষ্টা করতে হবে, প্রয়োজনে চলতে হবে বাতাসের উল্টো দিকে। আল্লামা ইকবালের ভাষায়–

ভোঁতা দৃষ্টিসম্পন্নরা বলে, চল যেদিক বাতাস চলে
অথচ তোমার কর্তব্য হলো, যুগের হাওয়াকে অনুগত করা!

মূলত উলামায়ে কেরামের অবস্থা এমনই হওয়া উচিত। কারণ এই উম্মাতের মধ্যে উলামায়ে কেরামের একটি ভিন্ন মর্যাদা ও গুরুত্ব আছে। তাছাড়া মুসলিম উম্মাহকে আল্লাহ তা'আলা একটি স্বতন্ত্র কিবলাও দিয়েছেন। সর্বাবস্থায় তাকে সেই কিবলামুখী থাকতে হয়। অধিকন্তু নামাযে যেভাবে তাকে এক সুনির্দিষ্ট কিবলা পবিত্র বাইতুল্লাহ শরীফমুখী থাকতে হয় তেমনিভাবে তার সকল প্রয়োজন প্রত্যাশা, সৎ কর্ম ও সততা সকল ক্ষেত্রেই নিবিষ্ট থাকতে হয় প্রকৃত কিবলা মনিব মহান আল্লাহ্ পাকের প্রতি।

সন্দেহ নেই আজকের মহতী মাহফিল আমার জন্যেও এক বিরাট সুযোগ। এটা আমার জন্যে এক গনীমত। এই গনীমতকে আমি নষ্ট হতে দিতে চাই না। তাই এই মহান সুযোগে আমি আপনাদের খেদমতে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খুব সংক্ষেপে আলোকপাত করব।

এক. আকীদা ও ইসলামের আদর্শগত সীমারেখা। এক্ষেত্রে হযরত উলামায়ে কেরামকে হতে হবে সম্পূর্ণ কম্পাসের মত। বিশ্বাস ও আদর্শের ক্ষেত্রে তাকে হতে হবে সদা অবিচল ও দৃঢ়চেতা এক বিশ্বস্ত রাহবর। এ ক্ষেত্রে যত বড় ব্যক্তিই তার সামনে আসুন তাকে তোয়াক্কা করার সুযোগ নেই। বোঝা-পড়া করার অবকাশ নেই। তাঁর কর্তব্য যথার্থ কিবলা বলে দেয়া। শাশ্বত সত্য, বিশ্বাস ও আদর্শের নির্দেশনাই তার অলংঘনীয় কর্তব্য। এক হলো হিকমত ও কৌশল, আরেক হলো ছাড়াছাড়ি ও আপোস-রফা। দু'টো এক নয়। একজন মানুষ কৌশলের সাথে সত্য কথা বলতে পারে। কিন্তু তাই বলে আপোস করার সত্যের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়ার কোন সুযোগ নেই আর হিকমতের কথাতো স্বয়ং আল্লাহ-ই বলেছেন ঃ

'ডাকো আল্লাহর পথে কৌশলপূর্ণ ও সুন্দরতম কথার মাধ্যমে।'

পক্ষান্তরে আপোস ও ছাড়াছাড়ির ক্ষেত্রে উচ্চারিত হয়েছে কঠিন হুঁশিয়ারি!

ودالوتدهن فيدهن -

"তারা চায়, আপনি যদি ছাড় দেন তাহলে তারাও ছাড় দেবে।" (কলম ঃ ৯) বরং আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলকে পরিষ্কার আদেশ দিয়েছেন ঃ

"আপনাকে যে কাজের আদেশ করা হয়েছে আপনি তার অকুণ্ঠ ঘোষণা দিন এবং মুশরিকদের প্রতি কানও দেবেন না।" অর্থাৎ এটা ইসলাম ও শিরকের সামান্ত বিষয়। এখানে আপোস-রফার কোন সুযোগ নেই। মুশরিকদের কথার প্রতি কর্ণপাত করার কোন অবকাশ নেই। নম্রতা, বিনয় আর উদারতা ভিন্ন বিষয়। তাওহীদ- আল্লাহ'র একত্ববাদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নত ও আদর্শ এবং ইসলামের স্পষ্ট আদেশ-নিষেধের ক্ষেত্রে পরিষ্কার আদেশ হলো, শরীয়ত যা বলেছে তাই উচ্চারণ করে যেতে হবে নিঃশংক চিত্তে। এজন্যেই আয়াতের শেষাংশে আর 'মুশরিকদের প্রতি কানও দেবেন না' বলে দেয়া হয়েছে। বিষয়টি দিবালোকের মত স্পষ্ট করে তোলাই আয়াতের লক্ষ্য। সুতরাং হকপন্থী উলামায়ে কেরামের কর্তব্য হলো–তাওহীদ রিসালাত ইত্যাকার শরীয়ত নির্ধারিত বিষয়গুলো সম্পর্কে পরিষ্কার কথা বলা যেখানে কোন দ্বিধা থাকবে না, জড়তা থাকবে না। তবে বলতে হবে কৌশলের সাথে। কবি গালিবের ভাষায় যেন এমন না হয়– 'মন্দভাবে বলে ভাল।'

অর্থাৎ যা বলে তা ভাল বলে। কিছু বলার ধরন খুবই মন্দ-অসুন্দর। বর্ণনা ও উপস্থপনার এই অসুন্দর অনেক অনিষ্টতা বয়ে আনে। অনেক ক্ষেত্রে মহাবিবাদ খাড়া হয়ে যায়। তাই যাতে কোন ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয় সেজন্যে সংযত ভাষা-বিধৌত আচরণের মাধ্যমেই তাঁকে এগুতে হবে অত্যন্ত ধীর ও দৃঢ়ভাবে। উলামায়ে কেরামের কৌশলপূর্ণ এই গতি ও চিন্তার ফলাফল হিসেবেই অদ্যাবধি

আমরা ইসলামকে দিনের সূর্যের মত পরিষ্কার আলোকিত অবস্থায় পেয়েছি যেখানে আলো-আঁধারের মিশ্রণ নেই, দুধ ও পানির অস্পষ্টতা নেই।

যে ব্যক্তি ধ্বংস হতে চায় তার ধ্বংস হবার সুযোগ বিপুল। পুরো উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সে ধ্বংসের নোনা সাগরে। কিন্তু তাই বলে সে ইসলামের ধারক-বাহকদেরকে সেজন্যে দোষারোপ করতে পারবে না। মুসলিম উম্মাহর বিশাল ইতিহাসের প্রতি যদি গভীরভাবে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে, তাদের ইতিহাসের দীর্ঘ পরিসরে এমন একটি বছর নেই যাতে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ ব্যাপকভাবে ভ্রষ্টতা ও গোমরাহীর শিকার হয়েছে ; বিচ্ছিন্ন ঘটনা তো বিচ্ছিন্ন-ই। এ মর্মে হযরত রাসূল (সা.) ও বলেছেন ঃ আমার উম্মাত একই সাথে কখনো ভ্রান্তির শিকার হবে না।

অথচ আমরা যদি ইহুদী জাতির প্রতি তাকাই তাহলে দেখব ইহুদী জাতি তার সূচনাকালেই বিকৃতির শিকার হয়েছে। আর খ্রীষ্ট ধর্মতো তার শৈশবেই এক বিভ্রান্তির মোড়কে বাঁধা পড়ে। অতঃপর বছরের পর বছর ধরে সেভাবেই এগুতে থাকে। তাই পবিত্র কোরআনে তাদরকে 'দাল্লীন' উদ্‌ভ্রান্ত বলা হয়েছে।

কিন্তু ইসলামের বেলায় এমন কিছুই ঘটেনি। সব ধরনের ধাঁধা, বিপর্যয়, বিভ্রান্তি ও বিকৃতি থেকে মুক্ত ও নিরাপদ এই দ্বীন। আজ অবধি তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য, সুন্নত ও বিদআতের ব্যবধান, ইসলাম ও জাহেলিয়াতের পার্থক্য, ইসলামী সভ্যতা ও জীবনবোধ এবং অনৈসলামী সভ্যতা ও জীবনবোধের ভিন্নতা একেবারে স্পষ্ট। হ্যাঁ, কোন দেশ বা জাতি বিশেষ কোন সময় বিশেষ কোন কারণে যদি কোন ষড়যন্ত্রের শিকার হয় সেটা ভিন্ন কথা। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও উলামায়ে কেরাম সতর্ক থাকেন এবং তার সংশোধনের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছেন ঃ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে সত্যের পতাকাবাহী হয়ে যাও।" 'আল্লাহর ফৌজ' কথাটা আমাদের ভাষায় একটি বিদ্রূপাত্মক শব্দ হলেও আয়াতে ব্যবহৃত (কাওয়ামিনা লিল্লাহ) বাক্যটির পরিভাষাগত অর্থ কিন্তু আল্লাহ্‌র ফৌজের মতই হয়। এখানে আল্লাহ্‌র ফৌজের সত্যের পতাকাবাহীদের বিশদ মর্যাদাই বিধৃত হয়েছে অর্থাৎ যারা আল্লাহর ফৌজ, যারা সত্যের পতাকাবাহী তারা সদা স্বীয় দায়িত্ব পালনে থাকে অতন্দ্র প্রহরীর মত জাগ্রত-সচেতন। কেউ জিজ্ঞেস করুক আর না-ই করুক, কেউ ডাকুক আর না-ই ডাকুক, তারা তাদের কর্তব্য আদায়ে কুণ্ঠিত হয় না, দ্বিধান্বিত হয় না। এখানে যদিও সমগ্র মুসলমানদেরকে লক্ষ্য করেই কথাটি বলা হয়েছে, তবুও এখানে উলামায়ে কেরামের গুরুত্ব বেশী। কারণ তাঁরা উম্মতের বিশেষ শ্রেণী।

তাই যদি সাধারণ উম্মতকে পতাকাবাহী হিসেবে জবাবদিহি করতে হয় তাহলে উলামায়ে কেরামকে জবাবদিহি করতে হবে বিশ্বময় মুসলিম সমাজ সম্পর্কে। মুসলিম সমাজ কোথায় কিভাবে স্খলিত হচ্ছে, বিচ্যুত হচ্ছে, তার পূর্ণ খোঁজ খবর নেয়ার দায়িত্ব, তাদেরকে সতর্ক ও সংশোধন করার দায়িত্ব উলামায়ে কেরামের।

উলামায়ে কেরামের আরেকটি বড় দায়িত্ব হলো, মুসলমানদের জীবন পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি, পারিপার্শ্বিক পরিবর্তন ও চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ খবর রাখা। জনবিচ্ছিন্ন অবস্থা উলামায়ে কেরামের জন্য নয়। কারণ জনগণ যখন উলামায়ে কেরাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে তখন তারা কাল্পনিক জগতের বাসিন্দা হয়ে পড়বে। কল্পনা বিলাসিতার স্রোত তাদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে দ্বীন থেকে অনেক দূরে। অভ্যস্ত হয়ে পড়বে তখন বিক্ষিপ্ত-পতিত জীবন যাপনে। দ্বীনের আহ্বান তখন আর সাড়া জাগাতে পারবে না তাদের অন্তরে। দ্বীনী দাওয়াত ও সমাজ সংস্কার দায়িত্ব আদায় হয়ে পড়বে তখন অসম্ভব। শুধু তাই নয়, বরং তারা ইসলাম ও ইসলামী জীবনবোধের প্রতি হয়ে পড়বে বীতশ্রদ্ধ। তখন ইসলামের পতাকাবাহীদের জন্যে এই দেশে অবস্থান করা হয়ে পড়বে ভীষণ মুশকিল। স্বগৃহে নির্বাসিত জীবন যাপনে বাধ্য হবেন তখন সম্মানিত উলামায়ে কেরাম।

ইতিহাস তো আমাদেরকে এ কথাই বলে, যে দেশে উলামায়ে কেরাম সব কিছুই করেছেন, কিন্তু স্বীয় সম্প্রদায়কে তাদের জীবন চিন্তা সম্পর্কে সচেতন করেন নি, মুসলমানদেরকে তাদের আত্মপরিচয় ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ করে তোলেন নি; আদর্শ উপমায় নাগরিক জীবন পদ্ধতি শিক্ষা দেননি, নিজেদেরকে জাতির নেতৃত্বের মর্যাদায় ভূষিত করতে সচেষ্ট হননি, সে দেশ ও জাতি তাদেরকে মূল্যায়ন করেনি, বুকে ধরে রাখেনি, বরং ভক্ষিত বমনীয় গ্রাসের মতোই উদ্‌গিরণ করে ফেলেছে। কারণ তারা নিজেরা নিজেদের আসন তৈরি করেন নি। আজ আপনারা আপনাদের চারপাশের দিকে দৃষ্টি মেলে দেখুন। আজ আপনাদের দেশ ও জাতি বাস্তবমুখী বুদ্ধিদীপ্ত নেতৃত্বের খুবই মুহতাজ।

আপনারা যদি আপনাদের দেশের সকল মুসলমানকে তাহাজ্জুদ আদায়কারী বানিয়ে ফেলেন, সকলকেই আল্লাহভীরু পরহেজগারে রূপান্তরিত করে ফেলেন আর তাদেরকে তাদের চারপাশ সম্পর্কে সচেতন না করেন, তারা যদি তাদের দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুই না জানে, দেশ ডুবছে, অসভ্যতা, অপসংস্কৃতি দেশকে গ্রাস করে ফেলছে, দেশ জুড়ে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগের তুফান বইছে, অথচ তারা কিছুই জানে না, তাহলে তাহাজ্জুদতো পরের কথা, তারা তো এক সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও পড়তে পারবে না। কারণ ভয়ংকর

এই সমাজ ও পরিবেশে তাদের কোন স্থান নেই। কারণ আপনারা তাদেরকে তাদের অবস্থান সৃষ্টির কথা বলেন নি। তাদের বরফায়িত ধমনীতে চেতনার আগুন জ্বালতে পারেন নি।

সুতরাং আপনাদেরকে ভাবতেই হবে। সাধারণ মুসলমানদের জীবন ও ভবিষ্যত নির্মাণের কথা। তাদেরকে আদর্শ নিষ্ঠাবান নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে। কারণ তারাই তো দেশকে ভয়াল ভ্রান্তি ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবে। প্রয়োজনে জীবন কুরবান করে দেবে। তারা যদি সচেতন না হয় তাহলে তো ইবাদত, বন্দেগী, দ্বীনী প্রতীকী কর্মকাণ্ড অনেক দূরের কথা, মসজিদ সংরক্ষণই তো হয়ে পড়বে ভারি মুশকিল। মুসলমানরা তো তখন স্বদেশে বিদেশী হয়ে পড়বে। স্বদেশী জীবন সভ্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ, সমকালীন আন্দোলন ও রাজনীতি সম্পর্কে বে-খবর, রাষ্ট্রীয় আইন ও রীতিনীতি সম্পর্কে অন্ধ জাতি দ্বারা তো নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, বরং এমন জাতি তাদের অস্তিত্বও ধরে রাখতে পারে না। নেতৃত্ব সেতো অনেক ওপরের কথা।

মিসর বিজেতা সাহাবী হযরত ইবনুল আস (রা.) যখন মিসর জয় করেন তখন আল্লাহ্ তা'আলাই হয়তো তাঁর হৃদয়ে বিশ্বাসের এ কথার উদ্রেক করেছিলেন, মিসর শত বছর নয়, বরং হাজার হাজার বছর ইসলামকে বুকে ধরে রাখবে। মিসর ইসলামের কেন্দ্রভূমি হিজাব থেকে খুব দূরে ছিল না। রোমীয় শাসনদণ্ডও তখন ভেঙ্গে গেছে। কিবতী খৃষ্টীয় শাসন ব্যবস্থাও বেদখল হয়ে পড়েছে। দেশ এখন কেবল মুসলমানদের–মুসলমান আরবদের, অথচ এই মুহূর্তে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলছেন ঃ

মনে রেখ! তোমরা সর্বক্ষণই শত্রুর মুখোমুখী–সীমান্ত প্রহরীর মত। তাই তোমাদেরকে সর্বদাই অতন্দ্র প্রহরীর মত সজাগ সচেতন থাকতে হবে। গাফলতি আর আলসেমির কোন সুযোগ নেই। অজ্ঞতা আর অজ্ঞতার ভান করারও কোন অবকাশ নেই।

আমাদের দেশের সার্বিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে এখন। প্রতিবেশী দেশ ও পরিস্থিতি আমাদের দেশকে রীতিমত নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক পরাশক্তিকেও উপেক্ষা করার উপায় এদেশের নেই। দেশে অজস্র চিন্তা-দর্শন সক্রিয়। শত সংস্কৃতির বিপ্লব চলছে। সভ্যতা-বিধ্বংসী শত আন্দোলন চলছে। শিক্ষানীতির রীতিমত পরিবর্তন হচ্ছে। মাঝে মধ্যে তো আমাদের বিশ্বাস ও ধর্মীয় মূল চিন্তার ওপরও আঘাত করছে। তাছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান ও ভাষাও নতুন সমস্যা

হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন প্রয়োজন আমাদের অবস্থার গভীর পর্যালোচনা। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার চিন্তা করা উচিত এবং সেজন্য উচিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

মুসলমানদেরকে বলতে হবে, দেশ ও জাতির প্রতি তোমাদেরকে অনেক কিছু করার আছে। দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা তোমাদের কর্তব্য। তোমরা যদি হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নমুনা পেশ করতে পার তাহলে ভবিষ্যতে তোমাদেরকে অনেক বড় দায়িত্বের অধিকারী করা হবে- প্রতিষ্ঠিত করা হবে নেতৃত্বের আসনে।

হযরত ইউসুফ (আ.) লক্ষ্য করেছিলেন, তাঁর দেশে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্বীয় যোগ্যতা, মানবতার প্রতি অপরিসীম কল্যাণকামিতা, বন্ধুত্ব ও ইনসাফের স্বাক্ষর না রাখতে পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দ্বীনও প্রচার পাবে না, তাঁর ধর্ম- দর্শনও সে দেশে কোন মর্যাদার আসন পাবে না, বরং এর জন্যে প্রয়োজন স্বীয় যোগ্যতার স্বাক্ষর ও তাঁর প্রতি আল্লাহর বান্দাদের নিঃশর্ত আকর্ষণ। তবেই এ দেশে হবে আল্লাহর নাম নেয়া সম্ভব। তাঁর মহিমাময় নামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। অবশেষে হয়েছেও তাই। সুতরাং আজ আমরা যারা মুসলমান তাদেরকে স্বীয় যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে হবে। প্রমাণ করতে হবে, আমাদেরকে বাদ দিয়ে দেশ চলতে অক্ষম। আমাদের কাঁধে ভর না করে দেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য স্পর্শ করতে পারবে না, বরং আমরা না থাকলে এই দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

মনে রাখতে হবে, আমরা যদি আমাদের চারপাশে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই, উষ্ণ-শীতল কোন আবহাওয়াই যদি আমাদেরকে স্পর্শ না করে, বরং আমরা যদি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত (ইধর-ডমভঢর্ধধমভ) ঘরে অবস্থান করতে থাকি যেখানে গরমের জ্বালা নেই, ঠাণ্ডার আগ্রাসন নেই, তাহলে সেটা হবে নিজেদের প্রতি চরম অবিচার। আর আমাদের ধর্মের প্রতিও হবে বিনাশী অত্যাচার। তাছাড়া রাষ্ট্রের একটা অংশ তো আর আরেকটা অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না, বরং মিশে থাকতে হবে। তবে আমি অন্যের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার কথা বলছি না। সেটা বলবই বা কেন? সব কিছুরই একটা সীমারেখা আছে। তাই উলামায়ে কেরামকে অন্যদের সাথে থাকতে হবে দাওয়াত ও যিকিরের সাথে। সর্বাবস্থায় স্বীয় পয়গাম তুলে ধরতে হবে জাতির সামনে। স্বীয় চাল-চলন, সব কিছুতেই থাকতে হবে নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির সবুজ আঁচড়। কোন অবস্থাতেই স্বীয় সভ্যতার স্বতন্ত্র বোধকে পরিহার করা যাবে না- জলাঞ্জলি দেয়া যাবে না।

আমার পরামর্শ হলো, আপনারা জীবনধারা থেকে আলাদা হবেন না। কারণ কেউ যদি স্বীয় সমাজ থেকে আলাদা হয়ে পড়ে তাহলে সে সমাজ থেকে দূরে সরে

পড়ে। জীবন্ত মানবগোষ্ঠীতে তার আর কোন স্থান থাকে না। আর আমি ইসলামকে এতটা সংকীর্ণ মনে করি না, সমাজ জীবনের অবস্থা, পরিস্থিতি ও চাহিদার দিকে তাকাতে গেলে ইসলাম ছুটে যাবে, বিশ্বাস ভেঙ্গে যাবে, দুর্বল হয়ে পড়বে। আমাদের পূর্বসূরিগণতো রাজত্ব করেছেন, নেতৃত্ব দিয়েছেন, অথচ তাঁদের তাহাজ্জুদ ছোটেনি। একটি সাধারণ সুন্নাহও হাতছাড়া হয়নি। আমাদের আদর্শ তো তাঁরাই।

হযরত সালমান ফারসী (রা.) ইরাকের গভর্নর ছিলেন। মাদায়েনের রাজীধানীতে থাকতেন। খানা খেতে বসেছেন। দস্তরখানা থেকে সামান্য একটু খাবার মাটিতে পড়ে গেছে। গভর্নর সালমান ফারসী (রাঃ) স্বহস্তে তুলে পরিষ্কার করে খেতে লাগলেন। উপস্থিত একজন বললঃ আপনি গভর্নর হয়ে এই কাজ করলেন? তখন তিনি উত্তরে বললেনঃ আমি তোমাদের মত বেকুবদের কথায় আমার প্রিয়তম নবীজীর সুন্নত ছেড়ে দেব? এটা ঠিক নয়, আগুন আসলে পানি থাকবে না আর পানি আসলে আগুন থাকবে না। এটা ভুল ধারণা। আপনি ইচ্ছা করলে পূর্ণ সততা, নিষ্ঠা, আদর্শ, তাকওয়া ও দ্বীনদারী রক্ষা করেও একজন পরিপূর্ণ সফল নাগরিক হতে পারেন।

আজ বিশ্ব জুড়ে সাংস্কৃতিক যুদ্ধ চলছে। শুধু আমাদের দেশেই নয়, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর অবস্থাও অনুরূপ। আরব দেশগুলো পর্যন্ত এখন ইউরোপীয় তপ্ত বাষ্পে পুড়ছে। আমেরিকা থেকে উদ্ভুত-প্রসবিত নতুন নতুন ফিৎনা গ্রাস করে চলছে দেশের পর দেশ। ইসলাম ও কুফুরীর লড়াই সর্বত্র। সময়ের আধুনিক পাহাড় পাহাড় সমস্যা থেকে চোখ বুজে থাকার তো কোন উপায় নেই।

তাই উলামায়ে কেরামের কর্তব্য হলো, শরীয়তের প্রত্যয়পূর্ণ আকীদা, বিশ্বাস, স্পষ্ট বিধানাবলী সম্পর্কে পাহাড়ের মত অবিচল আর লোহার মত কঠিন থাকা পক্ষান্তরে সমাজের আধুনিক সমস্যাবলীর সমাধান ও যুগের সার্বিক চাহিদা পূরণে পূর্ণ বিচক্ষণতা, হৃদ্যতা ও আন্তরিকতার সাথে এগিয়ে আসা। আমরা যদি এই দুটি দিক সমানে উত্তীর্ণ হতে পারি তাহলে আমরা ক্ষমতার মসনদে উঠে যাব এমনিট নয়, বরং আমি বলি, এই দুটি দায়িত্ব পালনে যথাযথভাবে সচেষ্ট হলে নেতৃত্ব নিজে ছুটে আসবে আমাদের কাছে।

মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও নাগরিক চেতনা সৃষ্টি করা একান্ত অপরিহার্য বিষয়। মুসলমানরা যে মহল্লায় থাকবে তাদের আচরণ চাল-চলন দেখেই যেন মনে হয় এটা মুসলমানদের মহল্লা। মুসলমানদের মধ্যে অবিনাশী চিরজাগ্রত

এই চেতনা সৃষ্টি উলামায়ে কেরামেরই দায়িত্ব। তাঁরা যদি তাঁদের এ দায়িত্ব পালনে যথাযথভাবে সচেষ্ট হন তাহলে সত্যিই তাঁরা এক আলোকিত ভবিষ্যত নির্মাণে সক্ষম হবেন- ইনশাআল্লাহ্!

আমার পরিচয়

আহ্নাফ ইবনে কায়েস একজন শীর্ষস্থানীয় আরব সরদার ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কিংবদন্তী রয়েছে, "আহ্নাফ গর্জে উঠলে এক লাখ তরবারি গর্জে ওঠে।" রাসূলুল্লাহর (সা.) সাক্ষাত লাভে ধন্য হতে না পারলেও তাঁর সাক্ষাতধন্যদের সাক্ষাত লাভে তিনি ধন্য হয়েছেন এবং তাঁদের সংস্রবে থেকেছেন, বিশেষ করে তিনি হযরত আলী (রা.)-এর নিকট একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হতেন।

একদিন জনৈক ক্বারী তাঁর সামনে এই আয়াত পাঠ করল ঃ

لقد انزلنا اليكم كتبا فيه ذكركم ط افلاتعقلون -

"আমি তো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি এমন কিতাব যাতে তোমাদের আলোচনা বিবৃত হয়েছে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?" [সূরা আম্বিয়া ঃ ১০]

আহ্নাফ ইবনে কায়েসের মাতৃভাষা ছিল আরবী। কাজেই আয়াত শুনে চমকে উঠলেন যেন নতুন কথা শুনলেন! বিস্ময়ের সঙ্গে বলতে লাগলেন, আমাদের আলোচনা? কুরআনখানা নিয়ে এসো তো; দেখ আমার কি আলোচনা এতে বিবৃত হয়েছে এবং আমি কোন্ শ্রেণীর লোকদের অন্তর্ভুক্ত।

পবিত্র কুরআন শরীফ তাঁর সম্মুখে আনীত হলো। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের আলোচনা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। একশ্রেণীর লোকের পরিচয় নিম্নোক্ত শব্দাবলীতে এভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

كانوا قليلا من اليل ما يهجعون - وبالا سحارهم
يستغفرون - وفى اموالهم حق للسائل والمحروم -

"তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করত নিদ্রায়, রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ততা ও বঞ্চিতদের হক।" [সূরা যারিয়াত ঃ ১৭-১৮-১৯]

তারপর কিছু সংখ্যক লোকের আলোচনা আসল যাদের অবস্থা নিম্নরূপ ঃ

تتجا فى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاو

طمعاو ممار زقنهم ينفقون -

"তাদের পার্শ্বশয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা স্বীয় পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে।" [সূরা সিজদা ঃ ১৬]

পুনরায় কিছু সংখ্যক লোকের আলোচনা।

والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما -

"তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে।" [আল ফুরকান ঃ ৬৪]

আবার এক কাফেলা তার চোখের সামনে দিয়ে অতিক্রম করল যাদের অবস্থা নিম্নরূপ ঃ

الذين ينفقون فى السراء والضراء والكلظمين
الغيظ والعافين عن الناس ط والله يحب المحسنين -

"তারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় ব্যয় করে এবং তারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ্ সৎ কর্মপরায়ণদের ভালবাসেন।"

[সূরা আল ইমরান ঃ ১৩৪]

এখনো তিনি অপলক নেত্রে অবলোকনই করছিলেন। একদল যুবক তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। যাদের পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

والذين تبوؤ الدار والايمان من قبلهم يحبون من
هاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما او توا
ويؤثرون على انفسهم ولو كانو بهم خصاصة ط ومن
يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون -

"এবং তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও অন্যদেরকে তাদের ওপর অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের সংকীর্ণতা ও কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।" [সূরা হাশর ঃ ৯]

ক্রমাগত তিনি সামনেই এগুচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে ভিন্ন এক চিত্র তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠল।

ياتوك بكل سحار عليم - فجمع السحرة لميقات يوم معلوم -

"যারা বড় বড় গোনাহ্ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে; যারা তাদের পালনকর্তার আদেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে, পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।" [সূরা শুরা ঃ ৩৭-৩৮]

হযরত আহ্নাফ নিজেকে ভাল করেই চিনতেন। বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! আমি বর্ণিত শ্রেণীগুলোর কোনটিতেই দেখছি না।

এবার তিনি ভিন্ন পথ ধরে অগ্রসর হলেন। এ পথে বিচিত্র ধরনের মানুষ তাঁর দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। এ দলের সাক্ষাত পেলেন যাদের পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

انهم كانوا اذاقيل لهم لا اله الا الله لا يستكبرون لا ويقولون ائنا لتاركوا الهتن الشاعرمجنون -

"তাদের নিকট "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই" বলা হলে তারা অহংকার করত এবং বলত, আমরা কি উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহদেরকে বর্জন করব?" [সূরা সাফ্ফাত ঃ ৩৫-৩৬]

সামান্য অগ্রসর হয়ে কিছু লোকের সন্ধান পেলেন–

واذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة ج واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون -

"যখন কেবল আল্লাহর কথা বলা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় আর যখন আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাদের উল্লেখ করা হয় তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।" [সূরা যুমার ঃ ৪৫]

কিছু হতভাগা লোকের অবস্থাও তাঁর চোখে পড়ল যাদেরকে বলা হবে,

ماسلككم فى سقر-

"তোমাদের কিসে দোযখে নিক্ষেপ করল?" [সূরা মুদ্দাস্সির ঃ ৪২]

তারা প্রতিউত্তরে বলবে–

ولم نك نطعم المسكين - وكنا نخوض مع الخائضين - وكنا نكذب بيوم الدين -

"আমরা নামায পড়তাম না, আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না এবং আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করতাম আমাদের নিকট মৃত্যু আগমন পর্যন্ত।" [সূরা মুদ্দাসসির ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৬]

আহ্নাফ বর্ণিত লোকদের চরিত্রাবলী দর্শন করে বিচলিত হয়ে পড়লেন। বলে উঠলেন, হে আল্লাহ্! এ সকল লোক থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি তাদের থেকে বিমুখ, অধিকন্তু তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্কও নেই।

তিনি নিজের ব্যাপারে না ছিলেন প্রতারিত আর না নিজেকে মুশরিক ও খোদাদ্রোহীদের দলভুক্ত মনে করার ন্যায় কু-ধারণা পোষণ করতেন। তিনি জানতেন, আল্লাহ্ তাআ'লা তাঁকে ঈমানের ন্যায় রত্ন দান করেছেন। তাঁর স্থান শীর্ষস্থানীয়দের পর্যায়ভুক্ত না হলেও মুসলমানদের মধ্যে আছে। তিনি চরিত্রের অন্বেষণে ছিলেন যাকে তিনি নিজের বলে দাবী করতে পারেন। স্বীয় ঈমানের প্রতি আস্থাবান হওয়া সত্ত্বেও নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা সম্পর্কে এদিকে যেমন পরিজ্ঞাত, অন্যদিকে তেমনি আল্লাহর করুণা ও ক্ষমার প্রতি আশান্বিত। নিজের আমলে না অহংকারী, না খোদার করুণা হতে নিরাশ। আহ্নাফ ইবনে কায়স এ ধরনের এক সমন্বিত চরিত্রের অনুসন্ধানে ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ চরিত্র কোরআনের ন্যায় বিবিধ জ্ঞানের ধারক, পূর্ণাঙ্গ, জীবন্ত প্রাণবন্তু কিতাবে অবশ্য মিলবে। ঈমানের ন্যায় মহারত্ন রেখেও স্বীয় পাপ ও ত্রুটির ওপর অনুতপ্ত আল্লাহর এমন বান্দা নেই কি? খোদার করুণা কি তাকে বঞ্চিত করবে? সমগ্র মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ যে কিতাব তাতে কি এমন ব্যক্তির চরিত্র ও আলোচনা পাওয়া যাবে না? তা হতে পারে না।

অনুসন্ধিৎসু আহ্নাফ স্বীয় অনুসন্ধানে কৃতকার্য হলেন। তিনি আল্লাহর পবিত্র মহাগ্রন্থে নিজেকে খুঁজে বের করলেন ঃ

واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا ط عسى الله ان يتوب عليهم ط ان الله غفور رحيم -

"আর কোন কোন লোক রয়েছে যারা নিজেদের কৃত অপরাধ স্বীকার করেছে;

তারা এক সৎ কর্মের সঙ্গে অন্য অসৎ কর্ম মিশ্রিত করেছে; শীঘ্রই আল্লাহ্ হয়ত তাদের ক্ষমা করবেন; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

[সূরা তাওবা ঃ ১০২]

তিনি আনন্দে নেচে উঠলেন। বেশ! বেশ! আমি প্রাপ্ত হলাম। আমি নিজেকে পেয়ে গেলাম। আমি নিজের পাপসমূহ স্বীকার করি। খোদার তাওফীকে যৎসামান্য নেক আমল যা করতে পেরেছি তা অস্বীকার করি না। আমি আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ নই।

قالو من يقنط من رحمة ربه الا الضالون -

"খোদার করুণা হতে কেবল সে-ই নিরাশ হতে পারে যে পথভ্রষ্ট।"

[সূরা হিজর ঃ ৫৬]

এ সবের সমন্বয়ে যে চরিত্র সৃষ্টি হয়েছে তা আমারই চরিত্র।

এ আয়াতে আমি ও আমার ন্যায় লোকের অবস্থা বিবৃত হয়েছে এবং তার এক নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আমি সেই মহান প্রতিপালকের প্রতি উৎসর্গীকৃত যিনি স্বীয় পাপী বান্দাদের ভুলে যাননি।

হযরত আহ্নাফের অনুসন্ধান কাহিনী এখানেই সমাপ্ত। হযরত আহ্নাফ দুনিয়া থেকে প্রস্থান করেছেন; স্বীয় স্রষ্টার সান্নিধ্যে পৌছে গেছেন। এ মহান গ্রন্থ কিন্তু রয়ে গেছে। আর তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্তরা যদি অন্বেষণ করে তবে এতে নিজেদের পরিচয় পাবে। বিভিন্ন শ্রেণী ও দলভুক্তরা যদি স্বীয় চেহারা দেখতে চায় তবে এ দর্পণে দেখতে পারবে। আমি, আপনি, সকলেই যদি আপন পরিচয়ের তালাশে বের হই তবে ইনশাআল্লাহ্ ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরব না। হযরত আহ্নাফ আমাদেরকে সত্য অনুসন্ধানের একটি নমুনা প্রদর্শন করেছেন। কুরআন পাঠ ও এতে গভীর অভিনিবেশের এক বিশুদ্ধ পন্থা শিখিয়েছেন। আমাদের কর্তব্য এই আদর্শ ও শিক্ষানীতি দ্বারা উপকৃত হয়ে কুরআন অধ্যয়নে মনোনিবেশ করা।

বুদ্ধিবৃত্তিক স্বনির্ভরতা অর্জন বুদ্ধিজীবীদের দায়িত্ব

[১৯ শে মার্চ ১৯৮৪ ইং-তে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ আয়োজিত সমাবেশে দেশের বুদ্ধিজীবী ও গবেষণা কাজে নিয়োজিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে প্রদত্ত ভাষণ।]

উপস্থিত সুধীবৃন্দ!

এই মুহূর্তে আমি অত্যন্ত পুলকিত ও আবেগাপ্লুত। আল্লাহর দরবারে লাখো শোকর, আজকের এই মুবারক মজলিসের মাধ্যমে আমার দশ দিনব্যাপী বাংলাদেশ সফরের শুভ পরিসমাপ্তি ঘটছে। সেই সাথে আজকের এই মজলিসে "খিদমতে খালক" প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন হতে যাচ্ছে।

প্রথমে আমি উপস্থিত লেখক বুদ্ধিজীবীদের খিদ্‌মতে অনুমতি হলে বলতে চাই, আমার সহকর্মী ও স্বগোত্রীয় বন্ধুদের খিদমতে একটি কথা আরয করতে চাই। সমগোত্রীয় এজন্য, আমিও আপনাদের মতো লেখাপড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট।

আপনাদের সামনে একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন কিংবা একটি ধাঁধা তুলে ধরতে চাই। আপনারা অব্যশ্যই জানেন, হিজরী সাত শতকের মাঝামাঝি সময়ে একটি নতুন শক্তিরূপে তাতারীদের অভ্যুদয় ঘটেছিল। বর্বর তাতারীরা মধ্যএশিয়ার এক বিস্তীর্ণ এলাকায় বসবাস করত। তাদের চিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি, রাজনীতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিমণ্ডল ছিল খুবই সংকীর্ণ। হাজার বছর ধরে বদ্ধ জলাশয়ের মাছের মতো বিচ্ছিন্ন জীবনে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তারপর এক সময় আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ ঘটল। বর্বর তাতার জাতি তাদের সংকীর্ণ পরিবেষ্টন ভেঙ্গে-চুরে এক দুর্বার গতিতে বেরিয়ে এল। তখনকার ইসলামী সালতানাত বা মুসলিম সাম্রাজ্য ছিল সুদূর বিস্তৃত, বিশেষত তুর্কিস্তানের খাওয়ারিজম শাহের সালতানাত ছিল তৎকালীন আলমে ইসলামীর বিশালতম সালতানাত। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর সামাজিক ও নৈতিক ভিত্তিমূলে পচন ধরে গিয়েছিল। সমাজের অধিকাংশ লোক হয়ে পড়েছিল অপরাধাসক্ত। সম্পদ, ক্ষমতা, বস্তুসভ্যতা ও সংস্কৃতির চোরা পথে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তাদের মধ্যে। পক্ষান্তরে সভ্যতার আলোবঞ্চিত তাতারীরা ছিল একটি প্রাণবন্ত জাতি। নবুয়তী পথ নির্দেশনা ও আসমানী শিক্ষার সাথে তাদের কোন পরিচয় ছিল না সত্য, তাতে তাদের জাতীয় চরিত্রে এমন কোন

ব্যাধিও ছিল না যা তাদের জাতীয় শক্তি ও উদ্যমে অবক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে কিংবা অলস ও বিলাসী জীবনের প্রতি আসক্ত করে তুলতে পারে। এমন একটি প্রাণবন্ত জাতি যখন খাওয়ারিজম সালতানাতের ওপর আপতিত হলো তখন খাওয়ারিজম শাহের সুশিক্ষিত বিশাল সেনাবাহিনী সে আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে পারল না। মোট কথা, তাতারীদের মুকাবিলা ছিল এক জরাগ্রস্ত সালতানাত ও অপরাধাসক্ত জাতির সাথে। ফল এই দাঁড়াল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমন্বয়ে যে সালতানাত আলমে ইসলামের বৃহত্তম শক্তিতে পরিণত হয়েছিল তা দেখতে দেখতেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। খাওয়ারিজম সালতানাতের পতনের পর আলমে ইসলামীতে এমন কোন শক্তি আর অবশিষ্ট ছিল না যারা তাতারীদের কিছুক্ষণের জন্য হলেও রুখে দাঁড়াতে পারে। মুসলিম উম্মাহ তখন এমন হীনবল ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তাতারীদের মনে করা হতো আসমানী মুসিবত এবং প্রায় প্রবাদ বাক্যের মতো একথা ছড়িয়ে পড়েছিলঃ

اذا قيل لك ان التتر قد انهز موا فلا تصدقه -

সব কিছুই বিশ্বাস করতে পার, তবে কেউ যদি বলে, তাতারীরা মার খেয়েছে তবে সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করো না। আকাশ ভেঙ্গে পড়া সম্ভব কিন্তু তাতারীদের পরাজিত হওয়া একেবারে অসম্ভব। এই ছিল সমসাময়িক আলমে ইসলামীর বাস্তব চিত্র।

বন্ধুগণ! হয়ত কিছুটা বিরক্তি বোধ করছেন, আলেম ও বিজ্ঞজনদের এই ভাবগম্ভীর মজলিসে অসভ্য তাতারীদের প্রসঙ্গ টেনে আনার কি প্রয়োজন ছিল? বন্ধুগণ! একটি বিশেষ প্রয়োজনেই তাতারীদের আমি এখানে টেনে এনেছি এবং মুসলমান বানিয়েই এনেছি। অনুগ্রহ করে আমাকে একটুখানি সময় দিন।

ইতিহাসের এক বড় জিজ্ঞাসা এই, তাতারী জাতি এক সময়ে গোটা আলমে ইসলামীকে পিষে মেরেছিল, সুদীর্ঘ ছয় শ' বছরের ঐতিহ্যবাহী হারুনুর রশীদের বাগদাদ যে তাতারীদের বর্বরতায় শ্মশানে পরিণত হয়েছিল, দজলা নদীর পানি একবার মুসলমানদের রক্তে লাল আর একবার লক্ষ-লক্ষ গ্রন্থের কালিতে নীল হয়ে গিয়েছিল, সেই নিষ্ঠুর জাতি কোন্ আশ্চর্য উপায়ে অকস্মাৎ জাতীয়ভাবে ইসলাম গ্রহণ করে বসল! এক সময় আলমে ইসলামীর জন্য যারা ছিল মূর্তিমান অভিশাপ, পরবর্তীকালে তারাই হলো ইসলামের মুহাফিজ রক্ষক। কিভাবে এটা সম্ভব হলো? কি কি কার্যকারণ এর পেছনে সক্রিয় ছিল? কোন উর্ধ্ব শক্তি ইসলামের সামনে

এমন একটি নিষ্ঠুর ও শক্তিমদমত্ত জাতির মাথা নত করে দিয়েছিল? ইতিহাসের এটা একটা প্রশ্ন যার বস্তুনিষ্ঠ উত্তর আমাদের খুঁজে পেতে হবে।

এ অভাবনীয় ঐতিহাসিক ঘটনার পেছনের মূল কারণ ছিল দু'টি। প্রথমত ইসলামী উম্মাহ্র অলী ও আধ্যাত্মিক বুযুর্গগণ তাতার জাতির প্রতি তাদের তাওয়াজ্জুহ ও মনোযোগ নিবদ্ধ করলেন। আল্লাহর দরবারে তাঁরা প্রার্থনার হাত তুললেন। শেষ রাতে ব্যথিত হৃদয়ের আহাজারিতে আল্লাহর আরশ কাঁপিয়ে দিলেন। হিকমত ও মহব্বত এবং প্রেম ও প্রজ্ঞার সাথে ইসলামের দাওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। আহলুল্লাহ ও আল্লাহর ওলীদের উপরিউক্ত কর্ম তৎপরতার একটি দৃষ্টান্ত জনৈক ইউরোপীয়ান ঐতিহাসিক তাঁর 'কদণ রেণটডদধভথ মত ত্রফটব' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আমি আমার "তারীখে দাওয়াত ওয়া আযীমাত" নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে তা বিবৃত করেছি। অন্য একটি কার্যকারণও এর পেছনে সক্রিয় ছিল। সেই কার্যকারণও এর পেছনে সক্রিয় ছিল। সেই কার্যকারণটির সাথেই আজকের মজলিসের সম্পর্ক আর এজন্যই শুধু এ মজলিসে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি।

শক্তির সব কয়টি উপায়-উপকরণই তাতারীদের কাছে মজুদ ছিল। সামরিক শক্তি তথা মার্শাল স্পিরিটের কোন কম্‌তি ছিল না। শৌর্য-বীর্য ও রণকৌশলেরও অভাব ছিল না। কষ্ট সহিষ্ণুতা ও সহজ-সরল বিলাসহীন জীবনেও তারা অভ্যস্ত ছিল পুরা মাত্রায়। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তাদের দৈন্য ছিল চরম। কোন লিটারেচার বা সাহিত্য সম্ভার ছিল না তাদের কাছে। সভ্যতা ও সংস্কৃতিরও কোন ধারণা ছিল না তাদের। ছিল না কোন উন্নত আইন ব্যবস্থা। যাযাবর জাতির মত গুটি কতেক উদ্ভট আইন-কানুন ছিল তাদের সমাজ ব্যবস্থার বুনিয়াদ, এমন কি যে ভাষায় তারা কথা বলত সে ভাষায় কোন হস্তাক্ষর পর্যন্ত ছিল না তাদের কাছে। এক কথায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উদার উপহারে সমৃদ্ধ মুসলিম ভূখণ্ডের ওপর যখন তাতারীদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো তখন তারা একেবারেই শূন্যহস্ত ছিল। তাদের কাছে না ছিল ভাষা ও সাহিত্য, না ছিল সভ্যতা-সংস্কৃতি আর না ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ন্যূনতম অনুশীলন। মুসলিম লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়কগণ এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন। তারা তাদেরকে সাহিত্য দিলেন, কাব্য দিলেন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত করালেন আর শেখালেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন। এভাবে গোটা তাতার জাতির ভেতর মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হলো। ফলে ধীরে ধীরে গোটা জাতি ইসলামের ছায়াতলে এসে আশ্রয়

নিল অর্থাৎ একদিকে আল্লাহর ওলী ও প্রিয় বান্দাগণ প্রেম ও ভালোবাসা এবং ইখলাস ও নিঃস্বার্থপরতা দিয়ে তাতার জাতির হৃদয় জয় করলেন। অন্যদিকে মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও চিন্তানায়ক- গণ তাদের মস্তিষ্ক জয় করে নিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়াল, তলোয়ার কিংবা অস্ত্রের ধারই কোন জাতির ওপর, কোন জাতির জন্য বিজয় লাভের একমাত্র পথ নয়। সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্য লাভের মাধ্যমেও একটি জাতিকে অতি সহজেই গোলাম বানানো যেতে পারে। আর রাজনৈতিক গোলামীর চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক গোলামী কোন অংশেই কম নয়।

আমি আপনাদেরকে একথাই বলতে চাই, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যে জাতি অন্য কারো দ্বারা প্রভাবিত সে জাতির অস্তিত্ব সর্বদাই বিপদ ও হুমকির সম্মুখীন। বিজাতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে যারা নিজেদের চিন্তার খোরাক কিংবা সাহিত্যের মাল-মশল্লা সংগ্রহ করে, বৃদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে দেওলিয়া জাতি কোনদিন সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে পারে না। নিজেদের আদর্শ ও মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে উপরিউক্ত জাতির আদর্শ ও মূল্যবোধই তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে গ্রহণ করবে, এমন কি শেষ পর্যন্ত তাদের ধর্মমতও গ্রহণ করে বসবে। মানব জাতির ইতিহাসে এমন উত্থান-পতনের ভূরি ভূরি নযীর রয়েছে।

আপনাদের খিদমতে আমি আরো আরয করতে চাই, আল্লাহ্ পাক আপনাদেরকে দেয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করেন নি। নয়-দশদিনের এ সংক্ষিপ্ত সফরে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ভ্রমণকারী একজন সচেতন পর্যটকের দৃষ্টি নিয়ে এ জাতিকে আমি যতটুকু বুঝেছি তাতে আমার এ প্রতীতি জন্মেছে যে, মেধা ও বুদ্ধিমত্তা, সরলতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, প্রেম ও হৃদয়ের উষ্ণতার দিক থেকে এ জাতি পৃথিবীর অন্য কোন জাতির চেয়ে পিছিয়ে নেই। এ জাতির মেধা ও বুদ্ধিমপনাদেরই স্বভাবী, যারা কোন প্রতিবেশী দেশে বাস করে তাদেরও বৃদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক গোলামী করা উচিত নয়। সর্বক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা সমুন্নত রাখুন। আর্থিক মাশুলের মত বুদ্ধিবৃত্তিক মাশুলও মানুষকে আদায় করতে হয়। আর তা আর্থিক মাশুলের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতিকর ও বেদনাময়। অতএব, নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক মাশুল নিজেদের দেশেই আদায় করুন। নিকটতম দেশ কিংবা শহরেও তা পাচার হতে দেয়া উচিত নয়। এ দেশের অর্থ-সম্পদ বাইরে পাচার হয়ে যাওয়া যেমন ক্ষতিকর, বাইরের কোন সমাজ থেকে চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা পাচার হয়ে আসাও তেমনি ক্ষতিকর। হ্যাঁ, একমাত্র ইসলামের প্রাণকেন্দ্র, ওয়াহীর অবতপনাদেরই স্বভাবী, যারা কোন প্রতিবেশী দেশে বাস করে

তাদেরও বৃদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক গোলামী করা উচিত নয়। সর্বক্ষেত্রে নিজেদের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সত্তা সমুন্নত রাখুন। আর্থিক মাশুলের মত বুদ্ধিবৃত্তিক মাশুলও মানুষকে আদায় করতে হয়। আর তা আর্থিক মাশুলের চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতিকর ও বেদনাময়। অতএব, নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক মাশুল নিজেদের দেশেই আদায় করুন। নিকটতম দেশ কিংবা শহরেও তা পাচার হতে দেয়া উচিত নয়। এ দেশের অর্থ-সম্পদ বাইরে পাচার হয়ে যাওয়া যেমন ক্ষতিকর, বাইরের কোন সমাজ থেকে চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা পাচার হয়ে আসাও তেমনি ক্ষতিকর। হ্যাঁ, একমাত্র ইসলামের প্রাণকেন্দ্র, ওয়াহীর অবতরণ ক্ষেত্র হারামাইন শরীফাইন থেকে ভাব, চিন্তা ও পথ নির্দেশনা গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রয়োজন হলে উপমহাদেশীয় আধ্যাত্মিক ও শিক্ষা কেন্দ্রগুলো থেকেও চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পাথেয় ক্ষেত্রে যাদের সাথে মৌলিক বিরোধ রয়েছে তাদের প্রভাব গ্রহণ, সাহিত্য, কাব্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ খুবই মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনবে।

দু'টি পথে তাতারী জাতি ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রথমত আধ্যাত্মিক পথে, দ্বিতীয়ত বুদ্ধিবৃত্তিক পথে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানগণই ছিল তখন শীর্ষ জাতি। মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তারা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আজকের ইউরোপ তখন অন্ধকারাচ্ছন্ন। একাডেমিগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব তখন এককভাবে ছিল মুসলমানদের হাতেই। সামরিক ও রাজনৈতিক বিচারে যদিও তারা ছিল বিজিত, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে তারাই ছিল বিজেতা আর তাতরীরা ছিল বিজিত। ফলে ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে বিজয়ী জাতিকে মাথা নত করতে হয়েছিল বিজিত জাতির কাছে। মুসলিম উম্মাহ্র বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে আজ আমার সে আশঙ্কাই হচ্ছে। এক হিতাকাঙ্ক্ষী ভাই ও কল্যাণকামী বন্ধু হিসেবে আপনাদের জন্য আমার পরামর্শ এই, নিজেদের সাহিত্য ও কাব্য নিজেরাই গড়ে তুলুন। সংস্কৃতি ও শিল্পের ক্ষেত্রে নিজস্ব স্টাইল ও রীতি গ্রহণ করুন এবং তার উৎকর্ষ সাধনে একনিষ্ঠ ও নিবেদিত হোন! আমি স্পষ্ট ভাষায় বলছি, জাতীয় কবি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামকেই আপনাদের তুলে ধরা উচিত। নজরুলের কাব্য ও সাহিত্য কর্ম বিশ্ব-সাহিত্য সভায় তুলে ধরুন এবং নজরুলকে নিয়ে গর্ব করুন। আপনাদের নিজেদের ভেতরেও অনেক প্রতিভা লুকিয়ে আছে সে সব প্রতিভা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করুন। নিজেদের ভেতর থেকেই স্টাইলের জন্ম দিন। নিজেদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করুন। মনে রাখবেন, এটা খুবই সংবেদনশীল ক্ষেত্র। এখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। সংস্কৃতির জগতে আপনাদেরকে পূর্ণ স্বাধীন ও

আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। ইতিহাসের একজন সাধারণ ছাত্র হিসেবে বলছি, এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না। আর ইতিহাসের প্রতিশোধ বড় নির্মম।

যে কারণে আপনাদের দেশ থেকে আমি আনন্দ ও আশাবাদ নিয়ে ফিরে যাচ্ছি তা হচ্ছে ইসলামিক ফউন্ডেশনের উপস্থিতি। বস্তুতপক্ষে এটা হচ্ছে সঠিক সময়ে, সঠিক দিকে একটি সঠিক পদক্ষেপ। একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতির জন্য নিজস্ব একাডেমী থাকা একান্তই অপরিহার্য। চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎস স্বদেশের মাটিতে এবং নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বাইরে থাকাটা স্বাধীন জাতির জন্য আদৌ মর্যাদাজনক ও কল্যাণকর নয়। হিন্দুস্থান ও মিশরের মুসলমানগণ পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার এবং ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণ শুধু এই, তাদের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার উৎস ছিল ইউরোপ, কেম্ব্রিজে-অক্সফোর্ডে কিংবা আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে। বাইরে থেকে আপনারা যা খুশি আমদানী করুন। খাদ্য আমদানী করুন, বৈজ্ঞানিক উপকরণ, কলকজা ও কারিগরিবিদ্যা আমদানী করুন। কিন্তু সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন ও আদর্শ আমদানী করা বন্ধ করুন। বাংলাদেশের মত স্বাধীনচেতা জাতির জন্য নিজস্ব স্টাইল থাকা উচিত।

সর্বক্ষেত্রে নিজস্ব স্টাইল ও রীতির প্রচলন হওয়া উচিত। কলকাতা ও পশ্চিম বঙ্গ আপনাদের অনুসরণ করুক। আপনারা তাদের অনুকরণ করতে যাবেন না। সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে আপনারা ইমাম হোন! সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের অধিকারী কোন স্বাধীন জাতির জন্য মুকতাদী হওয়া গর্বের কথা নয়। আপনাদের রয়েছে নিজস্ব ঐতিহ্য, নিজস্ব ইতিহাস। আপনাদের পক্ষে অন্য কোন জাতির দুয়ারে, আয়তন ও সংখ্যায় তারা যত বড়ই হোক, ধরনা দেয়া শোভনীয় নয়। প্রথম কাতারে নিজেদের অবস্থান মজবুত করার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্থান আপনাদের জন্য নয়। শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প-কাব্য, এক কথায় বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে যতদিন আপনারা আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন না করবেন, নিজেদের স্বতন্ত্র অবস্থান মজবুত করতে সক্ষম না হবেন, ততদিন আশ্বস্ত হওয়ার কোন উপায় নেই। যতদিন আমাদের কলেজ, বিদ্যালয় ও অন্য শিক্ষাঙ্গনগুলো আমাদের সামাজিক ও জাতীয় তথা ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের ভূমিকা পালনের জন্য এগিয়ে না আসবে, সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তার হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করার যোগ্যতা অর্জন না করবে, ততদিন সেগুলোর ওপরও ভরসা

করার উপায় নেই। একটি স্বাধীন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মূল্যবোধের সাথে অবশ্যই সংগতিপূর্ণ হতে হবে।

আরেকটি কারণেও আমার মনে যে, আজ আনন্দ ও আশাবাদের সঞ্চার হয়েছে, তা এই, বিলম্বে হলেও খিদমতে খালক বা আর্ত মানবতার সেবার গুরুত্ব আপনারা অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং সেজন্য বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। গতকাল সোনারগাঁয়ে গিয়েছিলাম। সেখানকার সেবা, কার্যক্রম ও যাবতীয় ব্যবস্থা অবলোকন করে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। স্টাফ-সদস্য ও স্থানীয় লোকজনদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমি আলাপ করেছি। গড়ে প্রতিদিন কতজন রোগী আসেন, কতজন রোগীকে ব্যবস্থাপত্র দেয়া হয়, কি পরিমাণ ওষুধ বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয় ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সত্যি এটা আল্লাহর বিরাট মেহেরবানী! এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল ক্ষেত্রের দিকে বিলম্বে হলেও আপনারা মনোযোগ দিয়েছেন যা এতোদিন খৃস্টান মিশনারীদের একচেটিয়া ময়দান মনে করা হতো। বস্তুত আর্ত মানবতা সেবার ছদ্মাবরণেই তারা এদেশের সাধারণ মানুষের সহানুভূতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সর্বত্র আজ এ ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, মিশনারী হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো অন্যান্য হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রের তুলনায় অধিক উন্নত ও সেবাধর্মী। যেহেতু তাদের মধ্যে মিশনারী মনোভাব থাকে সেহেতু চিকিৎসাপ্রার্থীদের সাথে তারা অত্যন্ত কোমল ও সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করে থাকে। ফল এই দাড়াঁয়, মানুষ সেখানে শারীরিক সুস্থতা লাভ করলেও তার আত্মা হয়ে পড়ে অসুস্থ ও রোগগ্রস্ত। অন্তত এ ধারণা নিয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়, আমাদের চেয়ে এরা অনেক ভালো লোক। তাদের মধ্যে মানবতাবোধ আছে। আছে সহানুভূতিপূর্ণ কোমল হৃদয়। এটাও এক ধরনের রোগ। একটি রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করে আরো মারাত্মক ও ক্ষতিকর আরেকটি রোগ নিয়ে সে বাড়িতে ফিরে আসে। তাই আমি মনে করি, এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হলো আর্ত মানবতার সেবায় গোটা জাতির আত্মনিয়োগ করা। খিদমতে খালকের ইসলামী আদর্শ সমাজের বুকে পুনরুজ্জীবিত করা যাতে মানুষ নিজের ঈমান ও বিশ্বাসের হিফাজত করে সহজ উপায়ে সঠিক চিকিৎসা কিংবা অন্ততপক্ষে সহৃদয় পরামর্শ লাভ করতে পারে। এই মহান প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি ও আমার সফরসঙ্গীরা নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

শুধু এ কথাই আমি আপনাদের বলব। প্রথমত শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও

রেজামন্দি লাভই যেন হয় আপনাদের যাবতীয় উদ্যোগ-আয়োজন ও কর্মকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য। এ বিশ্বাস রাখবেন, আপনারা ইবাদাতে নিয়োজিত আছেন। আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, বরং আমার ফতোয়া এই, আপনারা ইবাদতে ও সর্বোত্তম ইবাদতে নিয়োজিত আছেন। কেননা হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, "দুনিয়াতে যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট লাঘব করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার কষ্ট লাঘব করে দেবেন।" আরো ইরশাদ হয়েছে, "আল্লাহ্ পাক বান্দার সাহায্যরত থাকেন যতক্ষণ বান্দা তার মুসলমান ভাইয়ের সাহায্যরত থাকে।" হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ হয়েছে, "কিয়ামতে আল্লাহ্‌পাক একদল লোককে লক্ষ্য করে বললেন, "আমি অসুস্থ হয়ে ছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে দেখতে আসো নি।" তারা বলবে, "হে মহামহিম আল্লাহ্! আপনি কিভাবে অসুস্থ হতে পারেন? ইরশাদ হবেঃ আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। যদি তাকে দেখতে যেতে তবে আমাকেও সেখানে দেখতে পেতে।" বলুন, এর চেয়ে বড় মর্যাদার বিষয় আর কী হতে পারে!

দ্বিতীয়ত সেবা ও চিকিৎসার সাথে প্রেম ও সহানুভূতিও যোগ করতে হবে। তবেই এ বিরাট পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করবে। এই দুর্বল মুহূর্তে মানুষের হৃদয়ের কোমল মাটিতে ঈমান ও কল্যাণের বীজ বপন করে দিন। ইনশাআল্লাহ্ কোন একদিন তা ফলে ফুলে সুশোভিত হয়ে উঠবে। অন্ততপক্ষে এ বিশ্বাস তাদের অন্তরের বদ্ধমূল করে দিতে হবে, আল্লাহই হচ্ছেন শেফাদানকারী। ওষুধ ও চিকিৎসক উপলক্ষ মাত্র। আল্লাহর নির্দেশই ওষুধ তার ক্রিয়া করে। ওষুদের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। এর পর যখন রোগী শেফা লাভ করবে তখন তার অন্তরে নূর সৃষ্টি হবে। তার বিশ্বাসের ভিত মযবুত হবে।

আপনাদের সকলকে, বিশেষ করে সভাপতি সাহেব ও ফাউন্ডেশন কর্মকর্তাদেরকে আমার আন্তরিক মুবারকবাদ। একটি সঠিক ও নির্ভুল ক্ষেত্র আপনারা নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছেন। আপনাদের এ দূরদর্শিতা দেশ ও জাতির জন্য প্রভূত কল্যাণ বয়ে আনবে। এটা শুধু দেশের খিদমত নয়, দ্বীনেরও বিরাট খিদমত। আল্লাহ্ পাক এ প্রকল্পটিকে স্থায়িত্ব ও পূর্ণতা দান করুন!

সাথে সাথে আমি আপনাদেরকে একথাও বলব, অমুসলিম ভাইদের সাথেও সমান আচরণ করুন। এ ক্ষেত্রে ধর্ম বিশ্বাসের প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, এরা আল্লাহর বান্দাহ্, আল্লাহই এদের সৃষ্টি করেছেন। এদের কোনরূপ কষ্ট লাঘব করতে পারলে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন এবং আমরা উত্তম বিনিময় লাভ করব।

সেবার ক্ষেত্রে মুসলমান অমুসলমানের পার্থক্য করা উচিত হবে না, এমন কি ক্ষেত্র বিশেষে অমুসলিম ভাইকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মোট কথা, আপনার চিকিৎসা সহায়তা নিতে এসে সে যেন কোন রকম দ্বৈত আচরণ অনুভব করতে না পারে। আমাদের বোনেরাও সেবার ময়দানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাদের হৃদয়ের স্বভাবকোমলতা এক মূল্যবান সম্পদ। এমন কিছু তারা করতে পারেন যা পুরুষদের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের হিন্দুস্থানে ও এখানেও সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমার বোনেরাও পর্দার পেছনে থেকে আমার কথাগুলো শুনছেন জানতে পেরে আমি আনন্দিত হয়েছি। আল্লাহ্‌পাক তাদেরকে সমাজ সেবায় যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করার তাওফীক দান করুন!

শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণ! আরেকটি বিষয় আরয করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি আপনাদেরকে মিশরবিজয়ী সাহাবী হযরত আমর ইবন আস (রা.)-এর একটি ঐতিহাসিক বাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তখনকার দুনিয়ায় মিশরের অবস্থান ছিল তাহযীব, তামাদ্দুন ও সভ্যতার স্বর্ণ শিখরে। নীল নদী বিধৌত মিশর ভূখণ্ড ছিল দুনিয়ার সবচেয়ে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা। এমন একটি সমৃদ্ধ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দেশ জয় করার পরও কেন জানি হযরত আমর ইবন আস (রা.) কোন স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। একজন বিজয়ী সেনাপতির মনে যে স্বাভাবিক পুলক অনুভূত হয় তার লেশ মাত্রও ছিল না তাঁর অন্তরে। কেননা তিনি ছিলেন নবীর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত এক সাহাবী। কুরআনের শিক্ষা ও নবুয়তের দীক্ষায় তাঁর অন্তর ছিল আলোকউদ্ভাসিত। তিনি ছিলেন যুগপৎ ঈমানী প্রজ্ঞা ও সাহাবীসুলভ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। তাই তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সুদূর ভবিষ্যত পানে। বিজয়ী আরব মুসলমানদের ডেকে তিনি ঘোষণা করলেন তাঁর সেই ঐতিহাসিক বাণী যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য। আরব বিজয়ীদের লক্ষ্য করে তিনি বললেন ঃ انتم فى رباط دئم দেখো! মনে রেখো মিশরের সবুজ শ্যামল উর্বর মাটি, মিশরের সম্পদ, ভাণ্ডার, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও দেশের তাহযীব-তামাদ্দুন তোমাদের মনে যেন কোন মোহ সৃষ্টি করতে না পারে। এদেশের প্রাকৃতিক রূপ ও জৌলুসে তোমরা যেন আত্মবিমোহিত হয়ে পড়ো না। এখানে তোমাদের সঠিক অবস্থান ও দায়িত্ব সম্পর্কে সর্বক্ষণ সজাগ থেকো। মনে রেখ, তোমরা এখানে সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত আছ–এক গুরুত্বপূর্ণ চৌকিতে তোমরা অবস্থান করেছ। এ কথা ভেবে আত্মপ্রসাদ লোভ করো না, তোমরা কিবতীদের ওপর বিজয় লাভ করেছ কিংবা রোম সাম্রাজ্যের শস্যভাণ্ডার দখল করে নিয়েছ। একথাও মনে করো না, আরব উপদ্বীপ খুব নিকটে। কোন অবস্থাতেই আত্মপ্রতারণার শিকার হয়ো না। " انتم

فی رباط دائم এমন এক নাযুক জায়গায় তোমরা আছ যে, মুহূর্তের অসাবধানতায় তোমাদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। প্রতিটি মুহূর্তে তোমাদেরকে সজাগ সতর্ক থাকতে হবে। এক ঐশী বাণীর ধারক, বাহক ও প্রচারক হয়ে তোমরা এদেশে এসেছ। এক মহত্তম চরিত্রের আহ্বান নিয়ে তোমরা এখানে পদার্পণ করেছ। মুহূর্তের গাফিলতি ও দায়িত্ব হতে বিচ্যুতি তোমাদের এ বিজয়কে ধুলি লুণ্ঠিত করে দিতে পারে। সেই জীবন দর্শন থেকে চুল পরিমাণও যদি বিচ্যুত হও, যা তোমরা মদীনার পুণ্য মাটিতে নবুয়তের পবিত্র সাহচর্য লাভ করেছ, তবে তোমাদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হবে এবং মিশরে যারা আজ তোমাদের এ বিজয়কে স্বতঃস্ফূর্ত স্বাগত জানিয়েছে তারাই সেদিন তোমাদের বুক লক্ষ্য করে তরবারি উঁচিয়ে ধরবে। যদি মনে করে থাকো, সম্পদ উপার্জন, বিলাসী জীবন যাপন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করতেই তোমরা স্বদেশ ভূমি ছেড়ে মিশরে এসেছ, তবে এদেশবাসী তোমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র করুণা করবে না। একটি প্রাণীও সহীহসালামতে ফিরে যেতে পারবে না।

প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শ' বছর পূর্বে এক আরব সৈনিক যিনি কোন ইউনিভার্সিটির স্কলার ছিলেন না, বিজয়ী, আরবদের লক্ষ্য করে যা বলেছিলেন তা আজ এই মুহূর্তে ইসলামী বিশ্বের, বিশেষত আপনাদের এ দেশের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য।

বন্ধুগণ! তোমাদের মনে রাখতে হবে, انتم فی رباط دائم তোমরা সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত আছ। মুহূর্তের অসাবধানতা তোমাদের ঈমান, বিশ্বাস ও স্বাধীনতা বিপন্ন করে দিতে পারে।

আল-কোরআনের আলোকে সমকালীন বিশ্ব

[বক্ষ্যমাণ আলোচনাটি আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ। এটি তিনি ১৩৭২ হিজরী মুতাবিক ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে ২৪ মার্চ ভারতের বান্দাহ জামে মসজিদে পেশ করছিলেন।]

দাজ্জাল থেকে হুশিয়ার

আল্লাহপাক পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

نحن نقص عليك نبـــاهم بالحق ط انهم فتية امنوابرهم وزدنهم هدى ج وربطناعلى قلوبهم اذقاموا فقالوا ربنارب السموت والارض لن ند عوامن دونه الهالقد قلنااذاشططا۔ هؤلاء قومنا اتخذوامن دونه الهة ط لو لاياتون عليهم بسلطن م بين ط فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا۔

"আপনার কাছে তাদের ইতিবৃত্তান্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর তারা বললঃ আমাদের পালনকর্তা আসমান ও যমীনের পালনকর্তা; আমরা কখনও তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না, যদি করি তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হতে। এরা আমাদেরই স্বজাতি, এরা তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চাইতে অধিক গোনাহগার আর কে?" [সূরা কাহাফ ঃ ১৩-১৫]

সম্মানিত সুধীবৃন্দ! আমি আপনাদের সামনে সূরা কাহাফের প্রথম দিকের তিনখানা আয়াত তেলাওয়াত করেছি। জুমার দিনে সূরা কাহাফ তেলাওয়াতের অনেক ফযীলত রয়েছে। সহীহ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, যে ব্যক্তি জুমার দিনে সূরা কাহাফের প্রথম দশ আয়াত (কোন কোন হাদীসে শেষের দশ আয়াত। আর কোন কোন হাদীসের যে কোন দশ আয়াতের কথা উল্লেখ রয়েছে) তেলাওয়াত করবেন আল্লাহপাক তাকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে হিফাযত করবেন।

দাজ্জাল হলো কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ের তথা শেষ যামানার সবচে' বড় ভেল্কিবাজ। নবী করীম (সা.) সর্বদা এর অনিষ্টকারিতা থেকে আশ্রয় চাইতেন আল্লাহর কাছে এবং স্বীয় উম্মতকে দাজ্জালের ফিতনার ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করতেন। আজও জুমার দিন। সে হিসেবে এখন এ আয়াতগুলো পড়া এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা অত্যন্ত উপযোগী ও উপকারী মনে করছি। সুতরাং আসুন, আমরা কিছুক্ষণ সময় পঠিত আয়াতগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করি, লক্ষ্য করি সূরার বিষয়বস্তু আর দাজ্জালের ফিতনার মধ্যে কী সামঞ্জস্য ও যোগসূত্র রয়েছে এবং এই ফিতনা থেকে হিফাযত থাকারই বা কী রহস্য রয়েছে।

দাজ্জালের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে এক. সে নিজেকে সমকালীন বিশ্বে শক্তি ও ঐশ্বর্যের দিক থেকে সবচে' প্রভাবশালী বলে দাবী করবে এবং সে এর আলামত (ওহবঠমফ) হয়ে যাবে। দুই. সে যাবতীয় বস্তুকে এমনভাবে দেখাবে যা দেখতে এক রকম আর বাস্তবে থাকবে অন্যরকম। বস্তুর দৃশ্যমানতা ও বাস্তবতার মাঝে থাকবে আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

দাজ্জাল ও তাদজীল শব্দ দুটি আরবী যার অর্থ ধোঁকাবাজি, কৃত্রিমতা, প্রতারণা। দস্তাকে নকল করে দেয়া হলে দেখাবে রৌপ্যের ন্যায় তামাকে সোনার পানিতে ধুয়ে দেয়া হলে দেখাবে স্বর্ণের ন্যায়। আর এটাই হলো তাদজীল।

সূরা কাহাফের এক ঘটনায় ঐ সকল যুবকের কথা বলা হয়েছে, যারা সে যুগের কৌলিন্য, ধন-সম্পদ ও শান-শওকত এবং ক্ষমতা ও মর্যাদার কাছে মাথা নত তো করেই নি, পরন্তু মৌলনীতিকে স্বার্থের ঊর্ধ্বে হৃদয়ের আওয়াজকে পরিবেশের দাওয়াতের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। দমন করেছিলেন নফসের চাহিদাকে। প্রাণ রক্ষার চেয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন ঈমান রক্ষাকে। এভাবে জীবন সায়াহ্ন পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের স্বকীয় বোধ ও বিশ্বাসে অবিচল ও দৃঢ়পদ ছিলেন। আর এটাই হলো আসহাবে কাহাফের ঘটনা। অপর আরেকটি ঘটনা আছে, হযরত মূসা (আ.) ও হযরত খিজির (আ.) সম্পর্কিত যেখানে বস্তুর জাহের ও বাতেন এবং ঘটনার সূচনা ও পরিসমাপ্তির মধ্যে রয়েছে আসমান-যমীনে ফারাক। বাহ্যিক কর্তব্য ছিল এ রকম আর অন্তর্নিহিত সিদ্ধান্ত হতো অন্যরকম। ঘটনার শুরু হতো একভাবে, আবার শেষ হতো অন্যভাবে। এভাবেই এই সূরা তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ও ঈমানদীপ্ত ঘটনার মাধ্যমে যাবতীয় তাগুতের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত হানে।

আসুন, আজকের এই সময়ে আমরা আসহাবে কাহাফের ঘটনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি এবং এর থেকে এ যুগে কী শিক্ষা লাভ করতে পারি তা দেখি।

রোমকদের একটা সুদীর্ঘ শাসনকাল ছিল। তাদের সাম্রাজ্য ছিল ইটালী থেকে নিয়ে এশিয়া মাইনর ও শামের শেষ সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্ধ পৃথিবী ব্যাপ্তি বিশাল এ সাম্রাজ্য যার ডংকা বাজত ইউরোপ থেকে এশিয়া অবধি। সে সাম্রাজ্যে মূর্তিপূজা ও মুশরিকী আক্বীদা ও ধ্যান-ধারণা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছিল। জীবন সভ্যতার কোন স্তরই এর প্রভাবমুক্ত ছিল না। সমগ্র জীবন ব্যবস্থা মূর্তিপূজায় নিমজ্জিত ছিল। তাহযীব-তামাদ্দুন, দর্শন-ফিলোসফি, সাহিত্য- সংস্কৃতি সব কিছুতেই এর গভীর ছাপ ছিল। ইতিহাসের প্রতি যাদের দৃষ্টি আছে তারা জানেন, সে যুগে মূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণের কারুকার্যে অনেক উৎকর্ষ সাধন করেছিল এবং এক্ষেত্রে রোমকরা বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিল। রোমকদের মত মূর্তিনির্মাতা ও ভাস্কর্য শিল্পী দুনিয়াতে কমই জন্ম নিয়েছে। তারা এমন এমন মূর্তি নির্মাণ করত যা দেখে অনেকেই এগুলোকে জীবন্ত মানুষ বলে ধোঁকা খেত। মনে হতো এগুলো এই বুঝি কথা বলবে! যারা রোম ভ্রমণ করেন তারা এ সকল ভাস্কর্যের সামনে অবাক বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে থাকেন। সেখানে এগুলোর আধিপত্য এত যে, একজন সুস্থ রুচিরোধের মানুষের বমি এসে যাবে। এরূপ অবস্থাই আমার হয়েছিল ইউরোপের ঐ সকল ঐতিহাসিক নগরী ভ্রমণে যেগুলোকে হযরত ঈসা (আ.)-এর হাজার হাজার বছর পূর্বেকার বলা হয়। মাটি খননের মাধ্যমে এসব নগরী আবিষ্কৃত হয় এবং ওখানেও গৌতম বুদ্ধের অসংখ্য মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায়। সেই বিশাল সাম্রাজ্যের পূর্বাংশে বর্তমানে যেখানে তুরস্ক অবস্থিত, আফীস (ঋযদণ্রে) নামে এক শহর ছিল। ডিয়ানা দেবীর মন্দিরের জন্য শহরটি ছিল সারা দুনিয়ায় বিখ্যাত। মন্দিরটিকে বর্তমানেও পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্যজনক বস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়। সেই শহরে মূর্তিপূজা, যৌনপূজা ও আত্মপূজা চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। একদিকে নগ্নভাবে চলছিল মূর্তিপূজা, অন্যদিকে নির্বিঘ্নে চলছিল আত্মপূজা ও যৌন পূজা। ইতিহাস বলে, এ দুটোই সমানভাবে চলছিল তখন। অধিকাংশ আত্মপূজা ও যৌনপূজার উন্নতি ঘটেছে মূর্তিপূজার ছায়ায়। কারণ মূর্তিপূজা দর্শন ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট পরিসরে নির্ধারিত সময়ে নিজের দাসত্বের চেতনা ও অসহায়ত্ব প্রকাশের পর সব রকম নিয়মনীতি থেকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দেয়। এ দর্শনে আল্লাহর হাজির-নাযির হওয়া সংক্রান্ত কোন আক্বীদা-বিশ্বাসের ধারণা নেই। এটি স্বাধীন আত্মপূজা ও লাগামহীন নির্বিঘ্ন জীবন অতিবাহিত করার জন্য অত্যন্ত যুৎসই প্রমাণিত হয়েছে। এই চিত্র আমরা প্রাচীন হিন্দুস্থানে ও এ দর্শনের লালনভূমি গ্রীসে দেখতে পাই।

ঈমানী দীপ্ত সাত যুবক

সেই যুগেই রোম সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত শামে জন্মগ্রহণ করেন হযরত ঈসা মসীহ (আ.)। তিনি মানব সম্প্রদায়কে সঠিক নির্ভেজাল তাওহীদ ও সত্য আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাঁর দাওয়াত জাদুর মত কাজ করেছিল। এই প্রভাব তাঁর হাওয়ারী ঈসা (আ.)-এর সাহাবা, যাদের সংখ্যা ১২ ছিল এবং মুবাল্লিগদের মধ্যে প্রতিভাত হয়েছিল। তারা শাম থেকে ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিলেন। তাদের কথা যারাই শুনত তারা তাদের কালেমা ও ধর্ম বিশ্বাসের ওপর ঈমান আনয়ন করত। তাদের হৃদয় জগতে বিপ্লব সংঘটিত হতো।

আফীস নগরীর সাতজন তরুণও তাদের দাওয়াত কবুল করেছিল। তারা ছিল রাজ্যের আমীর-অমাত্যদের সন্তান। খুবই সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য পরিবারের মধ্যমণি। তারা মূর্তিপূজা ও আত্মপূজা পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদতের পথ অনুসরণ করল এবং অন্যরকম ভাবনায় নিমগ্ন হয়ে গেল। এখন তাদের কাছে মূর্তিপূজা ও আত্মপূজা এতটাই জঘন্য কাজ মনে হতে লাগল, এর প্রতি তাদের ঘৃণা জন্মাতে শুরু করল। পবিত্র কুরআন বিষয়টি এভাবে বলেছে ঃ

انهم فتـيـة امنو بو بـهم وزدنـاهم هدى وربطنـاملى قلو بهم -

"তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদেরকে সৎ পথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের মন দৃঢ় করে দিয়েছিলাম।"

এটাই হলো আল্লাহর সুন্নত বা নিয়ম, প্রথমে ব্যক্তি নিজের প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্তে কাজ শুরু করবে, তারপর আল্লাহর সাহায্য আসবে। প্রথম পদক্ষেপ ব্যক্তিকেই নিতে হবে আর এ পদক্ষেপ অধিকাংশ সময়ই নিজের জীবন বাজি রেখে নিতে হয়। এটা হিম্মত ও সাহস, নির্ভীকতা ও উদ্যমের পরীক্ষা। যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় সফল হবে তার জন্য পরবর্তী সকল পরীক্ষা সহজ হয়ে যাবে। তারপর যুবকরা ঐ পরীক্ষার সম্মুখীন হলো যে পরীক্ষা ঈমানের দাওয়াত কবুলকারীদের সামনের সব সময় এসে থাকে। তাদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও মুরুব্বীরা উপদেশ দিতে শুরু করল। কালের উত্থান-পতন সম্পর্কে বোঝাল। সতর্ক করল সম্ভাব্য বিপদের। তারা তাদেরকে হৃদয়োত্তাপ মিশ্রিত অত্যন্ত সহমর্মিতাসুলভ নসীহত করল। দুনিয়ার অন্য সকল জ্ঞান-গুণী ও বুদ্ধিজীবীর ন্যায় নম্রতা-কঠোরতা-লোভ-ভয়–সব রকম আচরণই করল। তারা বলল, তোমরা অত্যন্ত বিপজ্জনক খেলায় মেতে উঠেছ। তোমরা হলে সম্ভাবনাময় যুবক।

তোমাদেরকে নিয়ে তোমাদের খান্দানের, তোমাদের ভাই-বোনদের অনেক স্বপ্ন, তোমরা বংশের সুনাম বৃদ্ধি করবে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তোমরা উচ্চ পদাধিকারী হবে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান তোমাদের পথ চেয়ে আছে, অথচ তোমরা কিনা নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করছ! যে বৃক্ষে তোমাদের নীড় সে বৃক্ষই কর্তন করছ।

প্রিয় বৎসগণ! তোমরা কেন নিজেদের আলোকিত ভবিষ্যতকে তিমিরে ঢেকে দিচ্ছ। নিজেদের হাতে নিজেদের ভাগ্যে মহর লাগিয়ে দিচ্ছ।

প্রিয় উপস্থিত বন্ধুরা! এই মুহূর্তে অনিচ্ছাকৃতভাবে হযরত সালেহ (আ.) ও তাঁর সম্প্রদায় ছামুদের কাহিনী মনে পড়ে গেছে। অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সব সময়ই একটা সম্বন্ধ থাকে। মানুষের ফিতরাত সর্বযুগেই প্রায় এক রকম ছিল। হযরত সালেহ (আ.) যখন তাওহীদ ঈমান ও আমলে সালেহের দাওয়াত শুরু করেছিলেন তখন তার সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গও এই রকম হৃদয়োত্তাপ মিশ্রিত সহমর্মিতাসুলভ আচরণ দেখিয়েছিলেন তাঁর সাথে। তারা কত আশাহত ও ব্যথিত হৃদয় নিয়ে বলেছিল, সূরা হূদে এরশাদ হয়েছে ঃ

قالوا يصلح قد كنت فينامرجوا قبل هذ التنهان نعبد مايعبد اباؤناو اننالغ شك مماتد عونا اليه مريب -

"তারা বলল, হে সালেহ! তুমি তো অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ছিলে। তোমাকে নিয়ে আমাদের অনেক আশা-ভরসা ছিল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তোমার মাধ্যমে তোমাদের খান্দানের সোনালী দিন ফিরে আসবে। তাদের সম্মান সুখ্যাতি বৃদ্ধি পাবে, অথচ তুমি এ কোন কাহিনী নিয়ে বসেছ, কি আবোল তাবোল বকতে শুরু করেছ ওটা মন্দ, এটা হারাম, ওটা হালাল, এটা জায়েয, ওটা নাজায়েয। তোমাদের কাছে আমাদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও আমল সম্পর্কে কী ধারণা, তুমি কি আমাদেরকে ঐ সকল মাবুদের ইবাদত থেকে নিষেধ করছ, যাদের উপাসনা আমাদের বাপ-দাদাদের থেকে চলে আসছে। আমরা তো তোমাদের দাওয়াতের ব্যাপারে অত্যন্ত সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যে পড়ে আছি।" [সূরা হূদ ঃ ৬২]

যখন তাওহীদবাদী তরুণদের ব্যাপারে কুরআনের বর্ণনানুসারে যাদের সংখ্যা ছিল সাত, সে কালের বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানগর্ভ বিজ্ঞতাজনিত কথা কোনই কাজে আসল না, তখন ঐ বিজ্ঞজনেরা ভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করল এবং বললঃ এখন তোমাদর সামনে কেবল দুটি পথই খোলা আছে। যদি নিজেদের বর্তমান ধর্ম

বিশ্বাসে দৃঢ় থাক তবে বেঁচে থাকার আশা পরিত্যাগ কর। আর যদি জীবনকে ভালোবাস তবে এই বিশ্বাস থেকে ফিরে এস।

যুবকরা বললঃ আমরা বেঁচে থাকার আশা হাজারো বার পরিত্যাগ করতে পারি। কিন্তু একবারের জন্যও বর্তমান ধর্ম বিশ্বাস থেকে ফিরে আসতে পারব না। তারা এ নাজুক মুহূর্তে যে শব্দ প্রয়োগ করেছিল তা ছিল অত্যন্ত অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

সে সময়কার সে নগরীর বুদ্ধিজীবীরা প্রতি কথায়ই তাদেরকে জীবনের প্রয়োজনে ভবিষ্যত সফলতার সম্ভাবনা; জীবিকা নির্বাহের উপায়-উপকরণ, পদ-পদবী ও রুজি-রোজগারের উদ্ধৃতি দিত। বলত, বর্তমান আক্বীদা যদি পরিত্যাগ না কর এবং চলমান স্রোতের সাথে যদি একাকার না হও, তাহলে না পাবে চাকরি, না পদ-পদবী। চাকরি না পেলে খাবে কি? আর না খেতে পেলে বাঁচবে কি করে? কেমন যেন বেঁচে থাকার আর জীবিকা নির্বাহ করাই সব সমস্যা। জীবিকা কোত্থেকে আসবে? প্রতিপালন ও রিজিক দান কে করবে? তাওহীদপ্রিয় তরুণরা এ সমস্যার সমাধান দিল এই ঘোষণায় ঃ

اذقامـوا فقالوا ربنارب السموات والارض -

"যখন তারা দাঁড়াল। অতঃপর ঘোষণা করল, আমাদের প্রতিপালক তো তিনিই যিনি এ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রতিপালক।"

কেমন যেন তারা একথার ঘোষণা দিল ঃ আমরা আমাদের প্রতিপালককে চিনেছি এবং পেয়েছি। সুতরাং এখন জীবিকা নির্বাহের উপায়-উপকরণ নিয়ে ও বেঁচে থাকার কোন ভাবনা নেই। কারণ আমরা যাকে প্রতিপালক হিসেবে মান্য করেছি তিনি এ আকাশ ও যমীনের প্রতিপালক। আর আকাশ-যমীন এ দুটোর সাথেই হলো জীবিকা নির্বাহের উপায়-উপকরণের সংশ্লিষ্টতা। অতএব, যার কুদরতী কর্তৃত্বে এ দুটো জিনিস তাঁর কাছে প্রতিপালনীয় উপকরণের কি কোন কমতি আছে? যিনি এ সাত আকাশ ও সাত যমীনকে স্থির রেখেছেন এবং এগুলোর প্রতিপালন করেছেন তিনি কি সাতজন যুবকের প্রতিপালনে অপারগ?

সম্মানিত উপস্থিত সুধিগণ!

সব বিতর্ক রুবুবিয়্যাতের ব্যাপারে, উলুহিয়্যাতের ব্যাপারে নয়। আল্লাহ্ পাকের উলুহিয়্যাত সর্বনিকৃষ্ট কাফের মুশরিকরাও স্বীকার করে।

ولـئـن سـالـهـم مـن خـلـق الـسـمـوات والارض لـيـقـولـن الـلـه -

আর যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন, আকাশ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা কে? তবে তারা বলবে নিশ্চয় আল্লাহ্।

সব রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব, ঝগড়া-ফাসাদ, তর্ক-বিতর্ক প্রাধান্য ও গ্রহণের পরীক্ষা রুবুবিয়্যাতের ব্যাপারেই। জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে এরই সম্পর্ক সংশ্লিষ্টতা। যিনি এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন এবং একবার নিজের পরওয়ারদেগারকে চিনতে পেরেছেন তার জন্য আর কোন ভাবনা নেই, পরীক্ষা কিংবা মুসিবত নেই। এজন্যই বলা হয়েছে ঃ

ان الذين قـالوا ربنا الله ثم اسـتـقـامـوا تتنزل عليهم الـمـلـكـة الاتـخـافـوا ولاتحـزنـوا وابـشـروا بـالـجـنـة الـتـى كنتم توعدون -

"নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে ঃ তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোন।"

[সূরা হা-মীম সেজদাহ, ঃ ৩০]

পারতপক্ষে এজন্যই পবিত্র কুরআনে ঐ সাত তরুণের পরিচয়ের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম তাদের রুবুবিয়্যাতের ওপর ঈমান আনয়নের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, (তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তা তথা রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল।) [তাদের ইলাহ তথা উপাস্যের প্রতি ঈমান এনেছিল] বলা হয়নি।

যা হোক, সহধর্মীদের এই পদ্ধতি যখন ব্যর্থ হলো তখন তারা অন্য পদ্ধতি গ্রহণ করল। তারা বললঃ কোন বিষয়ে সত্যতার জন্য কোন না কোন মাপকাঠির প্রয়োজন রয়েছে। সবচে' বড় মাপকাঠি হলো, যিনি রাষ্ট্রের বা সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন যার নির্দেশে রাজ্য পরিচালিত হয়। আর তিনি এতটাই সৌভাগ্যশীল ও ভাগ্যবান যে, তার হাতের পরশে মৃত্তিকা স্বর্ণে পরিণত হয়। যে তার আঁচল ধরে তার ভাগ্য জেগে ওঠে।

সুতরাং এখন দেখ, রোম সাম্রাজ্যের শাহানশাহে আজম, তার উজীর-নাজির-আমীর-অমাত্য-নায়েবরা এবং যারা এ নগরীর শাসনকর্তা তাদের ধর্মবিশ্বাস ও মাযহাব কি? আমরা লক্ষ্য করেছি, তারা পূজা-অর্চনা করে ঐ সকল দেবদেবী অবতারের যাদেরকে তোমরা অস্বীকার কর।

এখন আমরা কি ঐ সকল সফল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তির মাযহাব ও ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করব, না কি তোমাদের মত নগণ্য কাণ্ডজ্ঞানহীন কম বয়সী মান-সম্মান ও শক্তিহীন আবেগতাড়িত যুবকদের মাযহাব গ্রহণ করব। এটা ঐ প্রাচীন বচন যা অতীতের প্রতিটি জাতিই তাদের নবীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে। হযরত নূহ (আ.)-কে তাঁর জাতি বলেছিল ঃ

قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون -

"তারা বলল, আমরা কি তোমাকে মেনে নেব, যখন তোমার অনুসরণ করছে ইতর জনেরা?" [সূরা আশ শোআরা ঃ ১১১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

ومانرىك اتبعك الاالذين هم اراذلنابادى الراى -

আমাদের মধ্যে যারা ইতর ও স্থূল বুদ্ধিসম্পন্ন তারা ব্যতীত কাউকে তো আপনার আনুগত্য করতে দেখি না।" [সূরা হুদ ঃ ২৭]

ঐ সকল বুদ্ধিজীবীর একটা দর্শন এটাও ছিল, বস্তুর ভাল হওয়ার মাপকাঠি হলো, বস্তুটি নগরীর সম্ভ্রান্ত লোক ও নেতৃত্বস্থানীয়দের মধ্যে প্রথম গোচরীভূত হয়। তারা বলল ঃ

وقال الذين كفرو اللذين امنوالوكان خيراما سبقونا اليه ط واذ لم يهتد وابه فسيقولون هذا افك قديم -

"আর কাফেররা মুমিনদের বলতে লাগল, যদি এ দ্বীন ভাল হতো, তবে এরা আমাদেরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে পারত না। তারা যখন এর মাধ্যমে সুপথ পায়নি, তখন শীঘ্রই বলবে, এতো এক পুরানো মিথ্যা।"

[সূরা আল- আহকাফ ঃ ১১]

তাদের বক্তব্য ছিল, মৌসুমের প্রথম ফল, বাজারের সর্বোৎকৃষ্ট ফল, কাপড়ের মধ্যে সবচে' ভাল নকশার পরিধেয় নব আবিষ্কৃত বস্তু ও জিনিসের মধ্যে সবচে' ভাল মডেলটি সর্বপ্রথম এ শ্রেণীর লোকদের কাছেই আসে। তারা তাদের বিস্ময় তা কখনো এভাবে প্রকাশ করেছে ঃ

وكذلك فتنابعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من ؕ بيننا ط اليس الله باعلم بالشكرين -

"আর এভাবেই আমি কিছু লোককে কিছু লোক দ্বারা পরীক্ষায় ফেলেছি–যাতে তারা বলে যে, এদেরকেই কি আমাদের সবার মধ্যে থেকে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহ দান করেছেন।" [সূরা আনআম ঃ ৫৩]

ঈমান দীপ্ত ঘোষণা

আফীস নগরীর ও তাওহীদবাদী ঐ সাত তরুণ তাদের এ যুক্তিরও সিদ্ধতা ও সত্যতা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তারা বলেন, আমরা ঐ রাষ্ট্রপ্রধান আমীরদেরকে মাপকাঠি মানতে রাজী, কিন্তু কিসের মধ্যে? ভোজনের তৃপ্তিতে, পোশাক-পরিচ্ছেদের ফিটফাট সৌন্দর্যে, নির্মাণ কৌশলের ক্ষেত্রে তাদের সুস্থ সুন্দর রুচিবোধ গ্রহণ করব। এসব ব্যাপারে তারা যেটাকে ভাল বলবে ভাল বলব, যেটাকে অপছন্দ করবে, অপছন্দ করব আমরাও। কিন্তু আক্বীদা-বিশ্বাস ও মাযহাবের ক্ষেত্রে তাদেরকে মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে আদৌ প্রস্তুত নই। নৈতিকতা-অনৈতিকতা-মূলনীতি-কল্যাণ-অকল্যাণের ব্যাপারে কারো অনুসরণ করার মানে হলো সেগুলোকে বিশুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া, অথচ আমরা তাদেরকে নৈতিকতা ও মানবতাবোধের ক্ষেত্রে অনেক হেয়, হীন ও নীচ দেখতে পেয়েছি। তারা নিজেদের জন্য জনপদের পর জনপদ বিলীন করে দেয়। ধ্বংস করে দেয় নগর পর নগর। একজন বিধবার দোপাট্টা, একজন রিক্ত নিঃস্বের মুখের খাবার, একজন এতীমের হাতের রুটি ছিনিয়ে নেয়ার মধ্যে এতটুকু লজ্জাবোধ করে না ওরা।

তবে আপনারা যদি আমাদেরকে হুকুমতের ভয় দেখান কিংবা বারবার রাষ্ট্রীয় চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করেন তাহলে আমরা বলবঃ রাজ্যের অস্থায়িত্বের ও অবিশ্বস্ততার তামাশা আমরা অনেক দেখেছি। এ রকম ধ্বংসশীল জিনিসকে সর্বজনীন বিশ্বস্ততার, যার কোন ক্ষয় নেই, মাপকাঠি মানা যায় না। যে আল্লাহ্ রাজত্ব দিতে পারেন সে আল্লাহ যখন ইচ্ছে তখন তা ছিনিয়ে নিতে পারেন। মুরুব্বীরা যদি কোন বাচ্চাকে খেলনা দেয় তবে সে খেলনা ফিরিয়ে আনার শক্তিও তিনি রাখেন। বাচ্চার জন্য এ আত্মম্ভরিতা করা উচিত হবে না, এই খেলনা সর্বদা তার হাতেই থাকবে, অন্য কেউ তার থেকে নিতে পারবে না। এ ব্যাপারে পবিত্র

কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

قل اللهم ملكِ الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء ط بيدك الخير ـ انك على كل شئ قدير ـ

"বলুন, ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাজ্য দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাজ্য ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।" [আল-ইমরান ঃ ২৬]

সর্বশেষ ঐ বুদ্ধিজীবীদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। তাওহীদবাদী তরুণরা নিজেদের মতে ও আক্বীদায় দৃঢ় ও অটল থাকল। সে যুগে চতুর্দিকে শাহানশাহে রোমের জয়জয়কার ছিল। সে জানতে পারল, অমুক নগরীতে সাতজন তরুণ যারা আমারই খেয়ে দেয়ে বড় হওয়া দরবারীদের চোখের আলো তারা তাদের মরুব্বীদের কথাবার্তা পর্যন্ত মানছে না। তখন সে নির্দেশ জারী করল, ঐ যুবকদেরকে অমুক মন্দিরে নিয়ে যাও এবং যেতে বাধ্য কর। যদি তারা মূর্তিকে গ্রহণ না করে তবে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর কর। যুবকরা মূর্তিপূজা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং নিকটবর্তী পাহাড়ের এক গুহায় আশ্রয় নিল নিজেদের ঈমান সংরক্ষণের তাগিদেই। সম্রাট যখন এ খবর জানতে পারলেন তখন তিনি গুহার প্রবেশ পথ বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, যেন যুবকরা গুহার ভেতর তিলেতিলে নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহপাক তার অপার করুণায় তাদের চোখে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিলেন এবং সুদীর্ঘ ৩০৯ বছর ঘুমিয়ে রাখলেন।

এ দীর্ঘ কালের পরিক্রমায় রোম সাম্রাজ্যে বিরাট পরিবর্তন এল। রোমের সম্রাট খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং এ ধর্মের জন্য একজন আত্মোৎসর্গীকৃত মুবাল্লিগ ও দাঈর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অসীম কুদরতে যুবকদেরকে জাগ্রত করলেন। তাদের একজন নগরীতে এল। এসে দেখল, দুনিয়ার অবস্থা পাল্টে গেছে, খৃষ্ট ধর্ম এখন রাষ্ট্রীয় ধর্ম। এক সময়ে যে কাজের জন্য মুণ্ডপাত করা হতো আজ সে কাজই অত্যন্ত সম্মানের ও গৌরবের। কাল যে ছিল ক্রুদ্ধ আজ সে মাহবুব। আর এভাবে যুবকদের দূরদর্শিতা, সত্যতা ও বিশুদ্ধতা প্রমাণিত হলো এবং ঐ বুদ্ধিজীবীদের মূর্তি বিষয়ক ধ্যান-ধারণা ব্যর্থ ও অকৃতকার্য প্রমাণিত হলো।

সুধি! পবিত্র কুরআন শরীফে এ ঘটনাটি শুধু একটি ঐতিহাসিক ও হৃদয়গ্রাহী ঘটনা হিসেবে বিবৃত হয়নি, বরং এ ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে এজন্য স্থান পেয়েছে, এ রকম ঘটনা ইতিহাসে বারবার ঘটেছে, সব সময় সব জায়গায় ঘটেছে, গোচরীভূত হয়েছে। মক্কার মুসলমানরাও এ অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। দুনিয়ার অন্যান্য প্রান্তের মুসলিমরাও এ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, শর্ত হলো, ঈমান-একীন-ধৈর্য-দৃঢ়তা-স্থিরতা ও সহনশীলতা এবং ত্যাগ ও কুরবানীর।

انه من يتق ويصبر فان الله لايضيع اجر المحسنين ـ

নিশ্চয় "যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ্ এহেন সৎ কর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৯০]

আল-কুরআন চিরন্তন ও দিগ্বিজয়ী একটি কিতাব। এতে সব যুগের সব জাতির সব সময়ের জন্য নির্দেশনা রয়েছে। মানবিক চরিত্র ও মানবিক সত্তার একটি চিত্র হলো এই যা ওপরে বিবৃত হয়েছে। এখন আরেকটি চিত্র এই কুরআনেই দেখুন, যা পূর্ব ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত ও স্বতন্ত্র। কুরআনের ভাষায়–

ومن الناس من يعبد الله على حرف ج فان اصابه خير اطمان به ج وان اصابته فتنة انقلب على وجهه ج خسر الدنيا والاخرة ط ذلك هو الخسران المبين ـ

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তবে ইবাদতের ওপর কায়েম থাকে এবং যদি কোন পরীক্ষায় পড়ে তাহলে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।" [সূরা হজ ঃ ১১]

এটা পবিত্র কুরআনের মুজিযা ও চিত্র উপস্থাপনের সর্বোচ্চ নমুনা। এ আয়াতখানা কি? এটি একটি স্বতন্ত্র মুজিযা। এটি একক ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি, গোষ্ঠীরও প্রতিচ্ছবি। জাতি ও উম্মাহরও প্রতিচ্ছবি। আরবী 'মান'-এর প্রয়োগ একক ও একাধিক উভয়টির ওপর প্রযোজ্য। মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা বিলকুল ঈমানের কিনারায় দণ্ডায়মান হয়ে তথা দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে ইবাদত করে। ইবাদত বলতে কেবল এতটুকুই নয় যে, তারা শুধু নামায পড়ে, বরং এর

মাফহুমে এটাও অন্তর্ভুক্ত, ইসলাম ও জাহিলিয়াত, ঈমান ও কুফুরের মাঝে সে সীমানা টানা হয়েছে আল্লাহর আনুগত্য ও ইসলামী আহকামের অনুকরণের ক্ষেত্রে তারা সে সীমানায় একেবারে শেষ রেখায় দণ্ডায়মান থাকে।

আলা হারফিন'-এর বাগবৈদগ্ধতা সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করা যেতে পারে। মানুষের চরিত্রের ও চিত্রটি আয়াতের বচনে যেভাবে ফুটে উঠেছে সেটি যদি কোন ক্যামেরা দিয়ে ধারণ করা হয় এবং তা কোন বিজ্ঞ ক্যামেরাম্যান ও চিত্রশিল্পী চিত্রায়িত করে, তবুও সেভাবে এটি প্রতিভাত হবে না। ঐ সমস্ত লোকের বিচক্ষণতা ও সাবধানতার সুন্দর চিত্র এই ছোট বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে, তারা এমন স্থানে দাঁড়ায় যেখান থেকে অন্য স্থানে কিংবা অন্য বৃত্তে চলে যাওয়া এতটুকু বিলম্ব ছাড়াই তাদের জন্য সব সময়ই সম্ভব। পা ওঠাতে দেরী হবে এই ভয়ে এরা ঐ রেখায় দৃঢ়ভাবে কদমও রাখে না। এরা কদম রাখে পুষ্পের ন্যায় দুর্বলভাবে যা বাতাসের এতটুকু স্পর্শে বা অবস্থার সামান্যতম হেরফেরের সাথে সাথে অন্য জায়গায় গোচরীভূত হয়। ঐ সমস্ত লোকের হাত থাকে যুগের শিরা-উপশিরায় তাদের দূরবীন সর্বক্ষণ রাষ্ট্র, সোসাইটি ও ক্ষমতাধরদের চোখের পলক ও ইশারা পর্যবেক্ষণ করে। তাদের মস্তিষ্ক লাভ-ক্ষতি ফায়দা-বেফায়দা যাচাই করার ক্ষেত্রে এতটুকু গাফেল থাকে না। যদি যুগের প্রচলন তাদের চিন্তা-চেতনার মত-অভিমতের ও অবস্থানের অনুপঙ্খি হয় তবে এক্ষেত্রে তাদের থেকে অধিক একাগ্রতা অন্য কারো মাঝে দেখা যায় না। তারা পূর্ণ স্থির মনে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে এ কাজ করতে থাকে। এজন্যই বলা হয়েছে ঃ যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয় তবে ইবাদতের ওপর কায়েম থাকে।

আর যদি দেখে রাষ্ট্র, সোসাইটি ও সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে সাথে সাথে এরাও নিজেদের চিন্তা-চেতনা পাল্টে ফেলে এবং পূর্বেকার ধ্যান-ধারণায় তহমত থেকেও রক্ষা করে নিজেদেরকে। তারা নিজেদের চেহারা-সুরত, আক্বীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, তাহযীব-তামাদ্দুন, ভাষা ও সংস্কৃতি এমন কি নিজেদের জাতীয়তাবোধকেও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সামান্যতম সময়ের প্রয়োজন অনুভব করে না। এই স্বার্থপর সুযোগ সন্ধানীদেরকে দেখে এই আয়াত যেভাবে উপলব্ধিতে আসে এবং এর ভাষা শৈলী ও বাগ্মিতা যেভাবে প্রতীয়মান হয় তা বৃহৎ কোন তাফসীর থেকেও প্রতীয়মান হয় না।

ভয়-ভীতি-সংশয় থেকে বেঁচে থাকার জন্য এই স্বার্থপর শ্রেণীর ব্যবস্থাপনা ও সাবধানতা সম্পর্কে জানার প্রয়োজন রয়েছে। (এদের পরিচয় হলো,) যদি ইসলামী

বিধি-বিধান পালন দ্বারা পার্থিব কোন ফায়দা অর্জিত হয় কিংবা ধন-সম্পদ লাভ হয় অথবা এগুলো ব্যতীত যদি হুকুমত ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে এদের চে' অধিক শরীয়ত প্রীতি ও শরীয়তের প্রতি দায়িত্ববান আর কাউকে পাওয়া যায় না। আর যদি এগুলো পালন দ্বারা সামান্যতম ক্ষতি ও ত্যাগের সম্মুখীন হতে হয় তাহলে এরা এ সকল বিধি-বিধান তো বটেই, পরন্তু মৌলিক আক্বীদাসমূহ পর্যন্ত অস্বীকার করে বসে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

ومن الناس من يقول امنابالله فاذا اوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ط ولن جاء نصرمن ربك ليقولن انا كنامعكم ط اوليس الله باعلم بمافى صور العلمين -

"কতক লোক বলে, আমরা আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন তারা নির্যাতিত হয়, তখন তারা মানুষের নির্যাতনকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে। যখন আপনার পালনকর্তার কাছ থেকে কোন সাহায্য আসে তখন তারা বলতে থাকে, আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম। বিশ্ববাসীর অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ কি তা সম্যক অবগত নন?" [আনকাবুত ঃ ১০]

যদি ঐ সম্বন্ধ সম্মানের কারণ হয় তাহলে এরা নিজেদের প্রাচীন ইতিহাস, পূর্বপুরুষ ও দূর অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে এবং কোথাও না কোথাও নিজেদের সম্পৃক্ততা ও সংশ্লিষ্টতা বের করে নেয়।

সাধারণত এ ধরনের স্বার্থপরদের পরিণাম শুভ হয় না এবং কোন শ্রেণীর কাছে তারা গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না।

বলা হয়েছে ঃ

সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত। এটাই প্রকাশ্য ক্ষতি।

কবি হয়ত এজন্যই বলেছিলেন ঃ

না আল্লাহকে পেল, না প্রতিমার সান্নিধ্য,

না এ কূল রইল, না ও কূল।

আমার মনে আছে, ১৯৪৭ সালের দাঙ্গার সময় কত মুসলমান যে শুধু এজন্যই স্বীয় ধর্ম পরিত্যাগ করেছে, তাদেরকে মুসলমান মনে করে হত্যা করা হবে, অথচ এর বিপরীতে ঈমানী পরীক্ষার একটি প্রাচীন কাহিনী শুনুন।

নাসির খান বেলুচী ও পাঞ্জাবের শিখ হুকুমতের মধ্যে একবার যুদ্ধ হয়েছিল। ঐ যুদ্ধের এক পর্যায়ের নাসির খান বেলুচী আহত হয়ে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়লেন। দু'জন শিখ সেনা তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। একজন বলল, তাকে শেষ করে দেবে। উল্লেখ্য, তখনকার বেলুচীদের চুল ছিল লম্বা লম্বা। সে হিসেবে নাসির খানের চুলে খোঁপা বাঁধা ছিল। আর এই খোঁপা দেখে অন্য সিপাই বলল, না না, ওতো দেখছি আমাদেরই ভাই। তাকে মেরো না। অতঃপর যুদ্ধ যখন শেষ হলো এবং নাসির খান বেলুচী তাঁর রাজ্যে ফিরে এলেন তখন তিনি নিজের চুল ছোট করে ফেললেন এবং পুরো জাতির চুল ছেঁটে ফেলার নির্দেশ জারি করলেন। তিনি বললেন, এই অমঙ্গলময় হতভাগা চুলের জন্য আমার মুসলমানিত্ব নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলে আমি শাহাদাতের সুধা পান করা থেকে বঞ্চিত হলাম। দেখুন, দু'টো চিন্তার মধ্যে কত ফারাক! কত পার্থক্য!

বিশ্বাসের বিজয়

সুধি! যখন অবস্থা ভাল থাকে, পরিবেশ অনুকূল থাকে, কোন মতবাদে টিকে থাকার মাধ্যমে ইনাম মিলে, পুষ্পবর্ষণ হয়, ঐ মতবাদে শামিল হওয়ার মধ্যে সম্মান ও খ্যাতি নিহিত থাকে, ঐ মতবাদে বিশ্বাসী জাতির ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকে, সে সময়ে ঐ মতবাদে দৃঢ় থাকার মধ্যে এবং ঐ আক্বীদা-বিশ্বাসে গর্বভরে প্রকাশ করার মধ্যে কৃতিত্ব ও বীরত্বের কিছু নেই। কিন্তু অবস্থা যখন অযুৎসই ও অপ্রতিকূল থাকে, বড় বড় বীরের পদক্ষেপে থাকে অসভ্যতা ও পাশবিকতা, কোন আক্বীদা-বিশ্বাস বা মতবাদকে গ্রহণ করার মানে মৃত্যুকে দাওয়াত দেওয়ার নামান্তর, ঐ মতবাদে বিশ্বাসী জাতির পতন নেমে আসে, ভাগ্য তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কালের দৃষ্টি সরে যায় তাদের থেকে, ঠিক সেই কঠিন মুহূর্তে ঐ মতবাদে দৃঢ় থাকা এবং ঐ জামাতের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা, জড়িত থাকা অত্যন্ত বীরত্ব, আনুগত্য ও কৃতিত্বের ব্যাপার। প্রতিটি সরকার ও রাষ্ট্রের কাছে ঐ সিপাহীরাই বেশী সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ, যারা যুদ্ধের ময়দানে প্রতিপক্ষের পাশবিকতার মুখেও দৃঢ় থাকে। প্রত্যেক সর্দার ও আমীর ঐ লোকদেরকেই বেশি সম্মান করেন যারা ক্রান্তিলগ্নেও তাদের সঙ্গ দেয়।

একজন প্রাচীন সর্দার তার এক লোকের প্রতি খুবই খেয়াল রাখত। সে লোকটিকে নিজের অন্যান্য সঙ্গী সাথী জী হুজুরের ভূমিকা পালনকারীদের চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিত। একজন তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সর্দার বললেন, আমাদের এলাকা যখন বিরান হয়ে গিয়েছিল, সেই একমাত্র ব্যক্তি যে নাকি তখনও আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। প্রকৃত অর্থে ভালোবাসা ও আনুগত্যের পরীক্ষা উত্থান ও উৎকর্ষের যুগের হয় না, হয় পতন দুর্ভোগ ও দুর্যোগের কালে। নৈকট্যের কারণে আনুগত্য প্রকাশ করার মধ্যে প্রকৃত আনুগত্যের প্রমাণ মিলে না; প্রকৃত আনুগত্যের প্রমাণ তখনই মেলে যখন অসৌজন্য ও অকাম্য আচরণের পরও আনুগত্য বহাল থাকে। এখানেই হযরত কাব ইবনে মালেক (রা.)-এর সত্য সুন্দর সঠিক নববী প্রেমের প্রকাশ পায়। রাসূল (সা.)-এর সাথে তাঁর সুনিবিড় সম্পর্ক ও অকৃত্রিম ভালোবাসা থাকার পরও নবীজী (সা.) মদীনার সমস্ত মুসলমানকে তার সাথে কোন প্রকার কথাবার্তা বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কেউ তার কথার উত্তর দিতেও প্রস্তুত ছিল না, এমন কি তার জীবনসঙ্গিনীকেও নির্দেশ দিয়েছিলেন তার থেকে পৃথক থাকতে। তার চোখে নেমে এসেছিল রাজ্যের অন্ধকার। শহরকে আর শহর বোধ হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল কবরস্থান। কুরআনের ভাষায় দুনিয়া এত প্রশস্ত হওয়ার পরও তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। বন্ধ হয়ে আসছিল তার দম। সেই সময়ে গুচ্ছানের বাঁদশাহর (যার দানশীলতার সম্মান ও সুখ্যাতি তৎকালীন আরবে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ছিল) আমন্ত্রনপত্র এল হযরত কাব (রা.)-এর কাছে, তোমাকে এমন অকাম্য কঠোর অসৌজন্যের মধ্যে থাকার প্রয়োজন নেই। তুমি আমার এখানে চলে এসো, আমি তোমাকে সুখী করে দেব। হযরত কাব (রা.) তখনই সময়টিকে গনীমত মনে করা এবং চিঠিটা গ্রহণ করার পরিবর্তে বাহকের সামনেই এটি আগুনের চুল্লিতে ছুঁড়ে ফেললেন এবং তার প্রিয়ের দেয়া পরীক্ষা সহ্য করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তার থেকে মুসীবতের ঘনঘটা শেষ হলো আর এভাবে সংশোধানের ও পরিণতি ভোগের সময় সীমা উত্তীর্ণ হলো।

এমনিভাবে শাওয়ালের ৫ তারিখ কুরাইশরা মদীনার ওপর চড়াও হয়েছিল, ঘিরে ফেলেছিল চারদিকে থেকে মদীনাকে, অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন মদীনার মুসলমানরা। তাদের না খাবার ছিল, না কোথাও থেকে রসদ আসার উম্মিদ ছিল। ক্ষুধা, ঠাণ্ডা, ভয়-ভীতি ও সব রকমের অসুবিধা বিরাজ করছিল।

স্বয়ং কুরআনেই সর্বাধিক সুন্দরভাবে এ চিত্র উপস্থাপন করেছেন ঃ

اذ جاء وكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت

الابصـــارو بلغت القلوب الـحناجــر وتظنون بالله الظنونا -

"যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে।" [আহযাব ঃ ১০]

অন্যত্র বলেছেন ঃ

"যখন দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে গিয়েছিল, মুখ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, সেই সময়েও ঐ সকল লোক যাদের আল্লাহপাক ঈমানের দৌলত দান করেছিলেন, আল্লাহর ওয়াদার ব্যাপারে যাদের একীন ছিল, তাদের ঈমানী শক্তি আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা এ অবস্থায়ও সম্পূর্ণ বিপরীত ফলাফল বের করেছিলেন। তারা তাদের নিঃসঙ্গতা ও অসহায়ত্বকে কেবল পরাজিতই করলেন না, বরং এটিকে বিজয় ও সফলতার দলীলে পরিণত করেছিলেন। যখন মুমিনরা শত্রুবাহিনীকে দেখল তারা বলল ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল।

সাহাবাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন ছিল অসাধারণ। পরিবেশই অসাধারণ ঘটনার জন্ম দেয়। রাতের আঁধার চিরেই সূর্য তার নেকাব খোলে। যখন যমীন তৃষ্ণার্ত হয় রহমতের বারিধারা তখনই হয় বর্ষিত।

হুবহু এই দর্শন থেকেই সান্ত্বনা পেয়েছিলেন হযরত ইয়াকুব (আ.)-যখন তাঁর তনয় ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটেছিল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

قـال بل سـولت لكم انفسكم امـرا ط فصبـرجـميـل ط عسى الله ان ياتينى بهم جميعا ط انه هوالعلم الـحكيم -

"তিনি বলেন ঃ কিছুই না তোমরা মনগড়া একটি কথা নিয়েই এসেছ। এখন ধারণই উত্তম। সম্ভবতঃ আল্লাহ্ তাদের সবাইকে এক সঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনি সুবিজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৮৩]

তিনি আরো বলেছিলেন,

يبنى اذهبـوا فـتـحـسـسـوا من يوسف واخيـه

ولاتايـســوا من روح الله ط انـه لايـايـس مـن روح الـلـه الاالقوم الكفرون -

"বৎসগণ! যাও, ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রমহত থেকে কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৮৭]

সম্মানিত সুধি! ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, এর সাথে সম্পর্ক গড়া এবং দিবালোকে তথা প্রকাশ্যে এর হুকুম-আহকাম মানা চারদিকে যখন প্রতিকূল পরিবেশ বিরাজ করে, মুসলমানদের সফলতা ও দুনিয়ায় ইসলামের জয় জয়কারের যুগ থাকে, তখনও ফখর, গৌরব ও আনন্দের বিষয়, কিন্তু পরীক্ষা ও মুসিবতের সময় আনুগত্য ও মানার মধ্যে যে তৃপ্তি, স্বাদ ও আনন্দ অনুভূত হয় তা অন্য কোন উপায়ে হয় না, আর এটা তখনই হয় যখন সত্যের ওপর অটল থাকা লোকেরা সত্য ন্যায়ের তাবলীগকারিগণ এবং নিজেদের আক্বীদা-বিশ্বাসের স্বার্থে পার্থিব লাভ ও সম্মান বিসর্জনকারিগণ এই দুনিয়াতেই জান্নাতের স্বাদ অনুভব করেন। তাদের শরীরের পরতে পরতে আল্লাহর হামদ ও শোকর প্রতিধ্বনিত হয়। আল্লামা ইকবাল হয়ত এজন্য বলেছিলেন ঃ

নেককারদের জন্য উচ্চ হিম্মতই হলো বেহেশ্‌ত। উপমহাদেশের মুসলমানদের জানিয়ে দাও, তোমরা সুখী হও; কেননা দ্বীনের পথে অটল থাকার মধ্যে বেহেশ্‌তের আনন্দ রয়েছে।

সমাপ্ত